...প্রৌঢ়া তখন জ্ঞানহারা হইয়া আপনি জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য রমণীরা বাধা দিয়া তাঁহাকে আটক করিলেন।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে—উপরের গাছতলা হইতে সেই বলিষ্ঠ গঠনের তরুণ যুবক, সহসা দুই হাত দিয়া ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে একনিমিষে নামিয়াই, গঙ্গাবক্ষে বিদ্যুদ্বেগে সাঁতার দিয়া ঘূর্ণীর দিকে চলিল।

দর্শকেরা আশ্চর্য্য হইয়া তারস্বরে—বাহবা দিয়া উঠিল। একজন নিম্ন শ্রেণীর বৃদ্ধ উৎসাহে চেঁচাইয়া কহিল—"সাবাস বটে, মরদ বাচ্ছা! মানুষ বলি ওই একরত্তি ছেলেকে!" তারপরে, নিজের সঙ্গীদের দিকে ফিরিয়া কহিল—"তোরা পুতুলের মত দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিস্ কি বুনো?"

এই ছোটলোকের এইটুকু ইঙ্গিত মাত্রেই চার পাঁচ জন নিম্ন শ্রেণীর দর্শক ত্বরিতে ছুটিয়া গিয়া জলে পড়িল। সেই ব্যাপার দেখিয়া অন্যান্য দর্শকেরা আবার উৎসাহে চেঁচাইয়া উঠিল।

তখন, সেই পুরোহিত ব্রাহ্মণঠাকুর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি নিজের গামছাখানা কোমরে জড়াইতে জড়াইতে, লোককে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিলেন—"ভয় নেই—ভয় নেই—আমিও এলুম বলে—"

সহসা উপর হইতে কে কঠোর বিরক্তির স্বরে ধমকাইয়া কহিল—

"থামো—থামো ভট্‌চায্‌,—বীরত্ব,-মনুষ্যত্ব তোমার সব বোঝা গেছে,... টোলের উপাধিতে মানুষের চেয়ে অন্য প্রাণীই বেশী গড়ে।"

পরক্ষণেই চাকরদের উদ্দেশ করিয়া সেই কণ্ঠস্বর দ্বিগুণ হুঙ্কার দিয়া উঠিল—

"হারামজাদা নিমকহারামের দল, মানুষ ডুবে মরে, আর তোরা—"

কথা শেষ হইল না, ভৃত্যেরা সভয়ে দেখিল—স্বয়ং রাধিকাবাবু উপর হইতে ভিড় ঠেলিয়া—চঞ্চল পদে নামিয়া আসিতেছেন!

তত্ক্ষণে—ঝপ্ ঝপ্ করিয়া জলে পড়িয়া—জন দুই ভৃত্য নরেন্দ্রের উদ্ধারে ছুটিয়াছিল।

—দর্শকেরা তাড়াতাড়ি সরিয়া পথ করিয়া দিল, রাধিকাবাবু চঞ্চলপদে জলের ধারে নামিয়া গিয়া, প্রৌঢ়াকে ধরিয়া বলিলেন—"ভয় নেই খুড়ি, ...তুমি অমন করছো কেন?"

প্রৌঢ়ার যেন এতক্ষণ চৈতন্য তিরোহিত হইয়াছিল। তিনি একবার সবেগে কাঁপিয়া, ফিরিয়া চাহিয়াই, কাঁদিয়া উঠিলেন—"রাধু, কি হল বাবা!—আমার নরেন—"

—"ভয় কি খুড়ি, তুমি অমন ব্যস্ত হচ্ছ কেন? একটু স্থির হও,...ওই দেখ ওরা নরেনকে ঘূর্ণী থেকে বার ক'রে এনেছে।"

রাধিকাপ্রসাদ প্রৌঢ়াকে আশ্বাস দিলেন। বাস্তবিকই তখন সকলে মিলিয়া নরেন্দ্রকে লইয়া তীরের দিকে ফিরিবার উপক্রম করিতেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি আবার সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

"সর্ব্বনাশ! নরেনকে বাঁচিয়ে, ও ছোক্‌রা নিজে যায় যে!...দেখ্—দেখ্ দেখ্—"

সন্তরণকারীরা আশ্চর্য্য হইয়া ফিরিয়া দেখিল যে, যে তরুণ যুবক সর্ব্বপ্রথমে গিয়া নরেন্দ্রকে টানিয়া ঘূর্ণীর বাহিরে আনিয়াছিল, সে এমন অবসন্ন হইয়া পিছাইয়া পড়িয়াছে যে, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সম্মুখের দিকে আর একটুও আগাইতে পারিতেছে না, বরং একটু একটু করিয়া পিছন দিকেই তাহাকে টানিয়া লইতেছে!...

দুইজন সন্তরণকারী তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গিয়া দুই পাশ হইতে তাহাকে সাহায্য প্রদান করিল। যুবক যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। তারপরে সকলে মিলিয়া যখন তাহাদের দুইজনকে তীরে আনিয়া তুলিল, তখন নরেন্দ্রের মত অবসন্ন না হইলেও, যুবকের দেহে শক্তি ছিল না।

অন্য লোকজনের সঙ্গে রাধিকাবাবু নিজে তাহাকে সযত্নে ধরিয়া, পূজার স্থানে বসাইতে গেলেন, কিন্তু সে হাঁফাইতে হাঁফাইতে ক্ষীণস্বরে বাধা দিয়া কহিল—"ওখানে না—ওখানে না, আপনারা ওঁকে দেখুন,...আমি এদিকে সরে বস্‌ছি।"

যেখানে পূজার আয়োজন হইয়াছিল, সেইখানে নরেন্দ্রকে কোলের উপরে শোওয়াইয়া, প্রৌঢ়া ততক্ষণে তাহার শুশ্রূষায় লাগিয়া গিয়াছিলেন এবং সমবেত অন্য মহিলাগণের সঙ্গে পুরোহিত তর্করত্ন ঠাকুরও তদ্বির করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যুবককেও সেইখানে আনিবার চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া, তিনি তাড়াতাড়ি রাধিকাপ্রসাদের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বড্ড কাহিল হ'য়ে প'ড়েছে বুঝি ?"

—"হ্যাঁ! ওইখানে নিয়ে যেতে চাইছি, তা যেতে চাচ্ছে না, বলে—এই দিকে তফাতে বস্‌ছি।...ওখানে গেলে মেয়েদের কাছে সেবা যত্ন হ'ত ভাল।"...

রাধিকা প্রসাদ যুবককে স্নিগ্ধকণ্ঠে অনুরোধ করিলেন—"ওখানে চলো, তোমারও শরীর খুব নেতিয়ে প'ড়েছে, শুশ্রূষা দরকার—"

—"আজ্ঞে ওখানে আপনাদের পূজোর আয়োজন—"

বলিতে বলিতে যুবক যেন সঙ্কোচভরে মুখ অবনত করিল। একটু তফাতে দর্শকের দল ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের ভিতর হইতে একজন খপ্‌ করিয়া বলিয়া উঠিল—"হয়তো অজাত-কুজাত হবে, তাই ওখানে যেতে ভরসা পাচ্ছে না।"

রাধিকাপ্রসাদ কট্‌মট্ করিয়া সেই দিকে চাহিলেন। কিন্তু তর্করত্ন ঠাকুর যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কি লোক...নাম কি ?"

—"নলিনীকান্ত ঘোষ...কায়স্থ।"

রাধিকাপ্রসাদের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি বলিলেন—"তবে

আর কি, আমরাও কায়েত,...ঘোষ ;...চল চল, ধ'রে নরেনের কাছে নিয়ে গিয়ে বসাই, মেয়েরা দেখাশুনো—"

বলিতে বলিতে রাধিকাপ্রসাদ তাহার হাত ধরিলেন। কিন্তু যুবক একবার সেই দিকে চাহিয়াই, ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"আজ্ঞে—আমরা যে হিন্দু নয়—"

—"সর্ব্বনাশ! তবে কি—কিরেস্তান না কি?" বলিয়া, তর্করত্ন একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন। কিন্তু যুবক ধীর ভাবে জবাব করিল—"আজ্ঞে না, খৃষ্টান নয়।"

"তবে—তবে?...ওঃ, তুমি বুঝি বেহ্মজ্ঞানী?"

"আজ্ঞে—"

—"বুঝেছি, বুঝেছি, আর বলতে হ'বে না, তাতেই এমন,...ওঃ! তা'হলে তোমার ওখানে না যাওয়াই কর্ত্তব্য হয়েছে।...আমাদের হিন্দুদের ক্রিয়া-কর্ম্ম বড় কঠোর ;...তা হ'লে রাধু বাবু! তুমি আর ওর হাত ধরে দাঁড়িয়ে কেন? চাকর দের ব'লে দাও ওর দেখা শুনো করবে!...তুমি বরং—ধাঁ করে মাথাটা ডুবিয়ে এস—"

ঘৃণা ও বিরক্তিতে রাধিকাপ্রসাদের মুখখানা কঠোর হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি কেবল মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"নেয়েছি তো—আবার কেন?"

তর্করত্ন ব্যাজার হইয়া বলিলেন—"কেন? বেহ্মজ্ঞানী ছুঁয়েছ যে, আবার না নাইলে তোমার নামে সংকল্প হবে কেমন ক'রে?...কি বল গো ছোট গিন্নী?"

কিন্তু প্রৌঢ়া ছোট গিন্নী জবাব দিলেন না। তিনি নরেন্দ্রের শুশ্রূষা করিতে করিতে সকল কথাই শুনিতেছিলেন। তাহাকে একটু সুস্থ দেখিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া একেবারে যুবকের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর

স্নেহ ভরে তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন—"এস বাবা আমার, কারুর কথায় মনে দুঃখ ক'রো না,...তুমি আমার ছেলের মতন।"

তর্করত্ন একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন—"হাঁ—হাঁ—ক্ষেপ্‌লে না কি? ক'রছো কি ছোটগিন্নী, তোমাদের মান্‌সিকের পূজো—"

—"থামো ঠাকুর!"

বলিয়া প্রৌঢ়া তিক্তকণ্ঠে কহিলেন—"দেবতা চিন্‌লে না ঠাকুর! খালি ভাঁড়ামী করে পূজো করার ছল শিখে রেখেছ। একে ছুঁলে যদি মা পূজো না নেন, তবে তেমন ঠাক্‌রুণের পূজো দিতে ঘোষবংশের কেউ চাইবে না।"

—"ঠিক ব'লেছ খুড়ি," বলিয়া, রাধিকাপ্রসাদ স্মিতমুখে কহিলেন—"যে মহত্ব, যে বীরত্ব আজ এই ছেলেমানুষ দেখালে, তা যদি আমাদের সমাজের মুরুব্বিদের থাকতো, তা'হলে আজ দেশের এই অধঃপতন হ'ত না।"

—"এস বাবা, আজ থেকে তুমি আমার নরেনের ভাই। চাতরার ঘোষেরা তোমাকে বুকে ক'রে রাখবে।" বলিয়া প্রৌঢ়া সস্নেহে নলিনের চিবুক স্পর্শ করিলেন।

———

২।১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিছুকাল পরের কথা।—

বিকালবেলা চাত্‌রা গ্রামের 'পদ্মবিলের' ঘাটে, সন্ধ্যাহ্নিক করিতে আসিয়া বৃদ্ধ রামপ্রাণ সার্ব্বভৌম রসিকঠাকুরকে বলিলেন—"দিনে দিনে এসব যা হ'য়ে উঠ্‌ছে ভটচায্‌, তাতে যে হিঁদুদের ধর্ম্ম কর্ম্ম আর কিছুই রইলো না!"

...প্রতিদিন বিকালবেলায় গ্রামের প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ মাতব্বরের দল যথা-নিয়মে এই ঘাটটীতে আসিয়া, সন্ধ্যাহ্নিকের উপলক্ষ্যে পরচর্চ্চার একটা বিরাট আসর জমাইয়া তুলিতেন। রসিক ভট্টাচার্য্য, দাশুঘোষ আর মহেশ নন্দীর সঙ্গে একটু আগে আসিয়া এই পরচর্চ্চা রূপ মুখরোচক আলোচনাটাই সুরু করিয়াছিলেন। কহিলেন—"আরে বল কেন—সাভ্যোম দা! আমাদের এই চাত্‌রা গাঁয়ের সমাজ হ'ল এ অঞ্চলের মাথা, এখানে যদি এমনিতর ব্যাপার নির্ব্বিবাদে ঘটে যায়, তা'হলে আর—'

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া সার্ব্বভৌম গলার পরদা আর একটু চড়াইয়া দিলেন—

"এখনো বছর ফেরেনি—কর্ত্তার কাল হয়েছে, এরই মধ্যে এই!...এর পর তো রাধুবাবুর দৌরাত্ম্যে আমাদের এ গাঁ থেকে বাস তুলে পালাতে হবে দেখছি।"

এতক্ষণ পরে মহেশনন্দী মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন সাভ্যোম খুড়ো?"

—"কেন ?" বলিয়া সার্ব্বভৌম ঠাকুর উত্তেজিতভাবে আরম্ভ করিলেন—"বলি, মনে পড়ে কি বাবাজি,—তোমার বাপ তখন বেঁচে,...তুমি কলকাতা থেকে একটা পাশ দিয়ে ঘরে এলে, আর হপ্তা না ফিরতে ফিরতে একজন ব্রেহ্ম-জ্ঞানী এলেন—এখানে বস্তিতে দিয়ে মেয়ে-ইস্কুল করবার চেষ্টায় !—তার কি হাল হয়েছিল মনে পড়ে ? তোমার বাবাই তো অগ্রগামী হ'য়ে, কর্ত্তার কাছে বলে, তাকে আগে গাঁ ছাড়া ক'রে দিয়ে এসে, তবে জলগ্রহণ করেছিলেন !...তোমাতে আর রাধুবাবুতে মিলে তার আদর-আপ্যায়ন, খাতির-যত্ন করেছিলে বলে, কি শাস্তি তোমাদের পেতে হয়েছিল বল দেখি ?...তাছাড়া 'ঘোলাগাঁয়ের নফর বোসের সেই নাকানি-চোবানির কথাটাও কি তোমাদের মনে পড়ে না ?...সেই থেকে এই চাত্‌রার সমাজ, সবার উপরে মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।—" তারপর একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলিয়া আক্ষেপের সুরে বলিয়া গেলেন—"আর কি সে দিন-কাল আছে রে ভাই, কর্ত্তাদের সঙ্গে সঙ্গেই গত হতে বসেছে। নইলে সেই চাত্‌রাগাঁয়ের বুকের উপর আজ এমন অনাছিষ্টি কাণ্ড ঘট্‌তে পারে ? সেও তো এই ব্রেহ্ম-জ্ঞানী আর মেয়ে-ইস্কুল নিয়েই ব্যাপার ! তবু, ঘোলাগাঁয়ের নফর বোস সেই দলে ভিড়ে, মেয়ে-ইস্কুল ক'রে হৈ-চৈ লাগিয়েছিল বলে, তাকে উদ্‌বাস্তু হ'য়ে গাঁ ছেড়ে জন্মের মত পালাতে হ'ল।...তার বংশের ভিতরে ছিল সবেধন এক ছেলে, আর তার এক বছরচার-পাঁচের মেয়ে, তা বুড়ো নফর বোসের মরণের পরেও তাদের কারুর আর পৈত্রিক ভিটের দিকে পা বাড়াবার পর্য্যন্ত সাহস হ'ল না।...নফরের ছেলে নন্দ তো রেলের চাকরি করতে করতে—সাত ঘাটের জল খেয়ে খেয়ে শেষ কালে ম'ল গিয়ে—বলাগড়ে। তার মেয়েটা যে কোথায় আছে,—না ম'রে বেঁচেছে,—তা কেউ জানে না।"

রসিক ভট্টাচার্য্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"আরে না না, সেই

কনকমালা তো,—নন্দর মেয়ে? শুনেছি সে এখন মুর্শিদাবাদে—একটা মেয়ে-ইস্কুলে মাষ্টারণী হয়েছে।...তারও একটা ন-দশ বছরের মেয়ে—"

সার্ব্বভৌম আশ্চর্য্যভাবে রসিকের মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন—

"ও—তাহলে বোধ হয় বেহ্ম-জ্ঞানী কি খৃষ্টান ধরে মেয়েটার বে দিয়েছিল।...জামাইটি বেঁচে নেই নিশ্চয়?"

রসিক কহিলেন—"না! নন্দ জামাইটি ভালই পেয়েছিল।—কোথায় নাকি হাঁসপাতালে ডাক্তারি ক'র্তো।—হ্যাঁ সেও—ওদের দলেরই ছিল। বিয়ের সময় কনকেরও বয়স হয়েছিল খুব, তা বেহ্মদের তো আর জাতিঃপাত হবার ভয় নেই! কিন্তু বরাতগুণে টিক্‌লো না। বছর পাঁচ ছয় হল কনক বিধবা হয়েছে। পুঁজির মধ্যে এখন তার ওই একটী মাত্র মেয়ে, নাম—তড়িতা,...এই পর্য্যন্তই আমি শুনেছি।"

সার্ব্বভৌম যথেষ্ট বিজ্ঞতার সুরে বলিতে লাগিলেন—"তা'হলেই বোঝ, নকর বোস যদি বে-চালে না চলতো, তা'হলে আজ তার নাতনীকে কি থান্‌ছাড়া-গান্‌ছাড়া হ'য়ে নিজের আর মেয়ের পেটের ভাতের জন্যে ইস্কুলে মাষ্টারনী হ'তে হয়?...বাস্ত—বাগান—পুকুর—অভাব ছিলনা তো কিছুর! এ সবই তো সমাজের বাইরে যাবার ফল?...এমনি ছিল এ গাঁয়ের শাসন।...কিন্তু এখন আবার সেই কাণ্ডই সুরু হ'তে চলেছে। কিন্তু ভাবো দেখি—তা'হলে নকর বোস অপরাধটা করেছিল কি? তার বংশের যারা রয়েছে, তাদেরকে এমন ভিটে ছাড়া করেই বা রাখা হ'ল কেন? ছি ছি ছি......এই সব ভেবেই তো রতন ঘোষ রাধিকাকে কলকাতায় কলেজে পড়াতে রাজী ছিল না; ধরে করে মত করালে কেবল ওই ছোট গিন্নী!"

রসিক ভট্টাচার্য্য একটুখানি শ্লেষের সুরে বলিলেন—"তাঁর কি বল না! বিধবা মানুষ—ছেলেপুলে নেই, অনাথ ভাইপোকে মানুষ করেছেন,

নিজের গণ্ডা ও পাকা-পোক্ত র'য়েছে; কাজেই ভাশুরের সম্পত্তির ওপর দরদ থাক্‌বে কেন? তাঁকে তো—"

রসিকের কথায় বিরক্তভাবে বাধা দিয়া এবার মহেশনন্দী উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"ছি ছি, এসব কি ব'লছেন? গ্রামের সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা তিনি—জমীদার বাড়ীর লক্ষ্মী! তাঁর কাছে হাত পেতে আজ পর্য্যন্ত কেউ কখনো নিস্ফল হয়ে ফেরেনি! এখন পর্য্যন্ত আপনাদের সম্মান, প্রতাপ—যা কিছু—সব কেবল তাঁর জন্যই বজায় রয়েছে।...তাঁর নামে এমন বল্‌ছেন?"

—"বলবে না? এ সব অনাছিষ্টির মূল তো তিনিই! শুনলুম তাঁর নরেনকে বাঁচিয়েছিল বলে, তিনিই রাধিকা বাবুকে মন্তর দিয়ে, বেহ্ম-জ্ঞানী ছোঁড়ার গুষ্টিবর্গকে আনিয়ে এ গাঁয়ে বাস করিয়েছেন! যা কর্ত্তাদের আমলে ঘটেনি, তা তিনিই ঘটালেন,—এ কি খুব সুখ্যাতির কাজ?... তাঁর গুণের কথা আমরা কি অস্বীকার করছি·····কিন্তু এই কাজের জন্যেই দুঃখে কথা বলতে হচ্চে।"

—"বলেন কি আপনারা! যে তাঁর ভাইপোর জীবন রক্ষা করেছে, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, তাঁর বড়ই গর্হিত আর অখ্যাতির কাজ হয়েছে—না?" বলিয়া, মহেশনন্দী মুখ ফিরাইয়া দাশুঘোষের দিকে চাহিলেন। কিন্তু সার্ব্বভৌম কহিলেন—

"বেশ তো! সে জন্য কৃতজ্ঞতা দেখাতে চান, অর্থের তো অভাব নেই, তাঁর? শুনেছি নাকি বড় গরীব তারা, যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করে তাদের যথার্থ উপকার করতে পারতেন। তাতে আমরা দশে মিলে তাঁর নাম-গান করতুম। তা নয়, সেই ছোকরার বাপ মাকে আনিয়ে এ গাঁয়ে বাস করাবার কি দরকার ছিল?···পশ্চিম পাড়ার লোকেরা তো আমাকে বলে বলে অতিষ্ঠ করে তুলেছে,···আর বলবে নাই বা কেন?—গিন্নী মাগী

যে খেরেস্তানীদের—বেহদ্দ—! দিন-রাত, জুতো-মোজা পরে হুট্ হুট্ করে লোকের ঘরে ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ছে! কোথায় কার অসুখ-বিসুখ হয়েছে—কোথায় কার সেবা করতে হবে—কোথায় কার ডাক্তার-বদ্যি ডাকতে হবে—কোথায় কার চিঠি-পত্তর লিখতে-পড়তে হবে—কোথায় কার কি দরকার, এই সব করেই বেড়াচ্ছেন!”

মহেশ কি একটা বলিতে গিয়াই বাধা পাইলেন। সার্ব্বভৌম পুনরায় কহিলেন—“হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমরা বলবে না কেন, ভিতরে ভিতরে দলে ভিড়েছ কি না! নইলে আর গ্রামের ভিতরে সে মাগী মেয়ে-ইস্কুল করে বসতে পারে!...আজ কর্ত্তা বেঁচে থাকলে ওই ইস্কুলঘর করে দেওয়া নিয়ে রাধিকা বাবুর অপমানের একশেষ হয়ে যেত!”

মহেশ নন্দী স্মিতমুখে কহিলেন—“শুনছি ভবতারণবাবু এখানকার সর্ব্বে-সর্ব্বা হবেন।......কিন্তু তখন আর আপনাদের কোন জারীজুরীই খাটবে না। ভবতারণ বাবু পণ্ডিত—জ্ঞানী—বহুদর্শী—বুদ্ধিমান! তার উপর ধর্ম্ম-প্রচারকের কাজে নানা দেশদেশান্তরে এতকাল ঘুরে বেড়িয়ে লোকচরিত্রে তাঁর অভিজ্ঞতাও জন্মেছে যথেষ্ট। এরকম লোককে সদর নায়েব করে, রাধিকাবাবু যদি তাঁর জমীদারীর উন্নতির চেষ্টা করেন, তা'তে তো আর অন্যায় বলা যায় না।...তা ছাড়া আপনারা এই তুচ্ছ ব্যাপারে এত হৈ-হৈ লাগিয়াছেন—যে কেন, তাও বুঝতে পারি না! দেখুন, এখন আর সে দিনকাল নেই—যুগ পরিবর্ত্তন হচ্ছে, চারদিকেই একটা জাগরণের সাড়া পড়ে গেছে, এখন আর মিছে চোখরাঙানীতে কাকেও দাবিয়ে রাখতে পারবেন না। লাভের মধ্যে সমাজে আপনাদের যে প্রতাপ আর সম্মানটুকু এখনো আছে, তাও নষ্ট হ'য়ে যাবে!...দেখছেন তো—এই যে তিন মাস ধরে ক্রমাগত ঘোঁট করে বেড়াচ্ছেন, তাতে ফল কি হল? ক'জন লোককে দলে টানতে পেরেছেন? বরং তাদেরই সম্মান-প্রতিষ্ঠা আরো বেড়ে

যাচ্ছে।...আপনাদের এত উত্তম সত্ত্বেও দেখুনগে—'কমলবাসিনী' ইস্কুলে মেয়ে আর ধরে না। শীগ্‌গির আরো ঘর তোলবার দরকার হবে। তা'ছাড়া ভবতারণ বাবুর স্ত্রীও আর একলা পেরে উঠছেন না, আরো জন-দুই-তিন শিক্ষয়িত্রী বাহাল করবেন বল্‌ছিলেন।...যেখানে উদারতা—মহত্ত্ব—মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায়, সেখানে যে ভগবান্‌ সহায় হন, লোক আপনা থেকে ছুটে গিয়ে মাথা পেতে দাঁড়ায়!...প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম তো অনুদার নয়? কিন্তু আপনারা শুধু নিজেদের স্বার্থ আর প্রতাপ বজায় রাখবার জন্য তাকে সংকীর্ণ করে যে সমাজ-গণ্ডীর ভিতরে বেঁধে রাখতে চান, তা লোকে এখন বুঝেছে কাজেই তা আর মানবে কেন?...যদি যথার্থই ধর্ম্ম রক্ষা করা আপনাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে পরস্পরে দ্বেষ—হিংসা—স্বার্থচিন্তা ছেড়ে, আগে নিজেদের মনুষ্যত্বকে বজায় রাখুন; ব্রাহ্মণ—যথার্থ ব্রাহ্মণ হোন। তখন দেখবেন—ধর্ম্মের প্রভায় হিঁদুর দেশ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে!"

—"ঠিক কথা বলেছ ভাই!" বলিতে বলিতে সেই মুহূর্ত্তে তর্করত্ন আসিয়া মহেশ নন্দীকে সমর্থন করিলেন—"এ কথা এখন আমি বুঝেছি। বিপদে না পড়লে মানুষ চেনা যায় না। কলকাতার নলিনের সেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব দেখেও আমার চোখ খোলেনি, এদের সঙ্গে ভবতারণ বাবুদের বিপক্ষে লড়ছিলুম। কিন্তু আমার ছেলেটাকে নিয়ে এই যে যমে-মানুষে টানাটানি চল্‌ছে, ক'দিন ধরে এঁদের দোরে দোরে হত্যা দিয়েও একটা প্রাণীরও সাহায্য পাইনি, বরং—ওলাউঠা হয়েছে বলে,—এ ক'দিন থেকে এঁরা কেউ সে পথের ধার দিয়েও ঘেঁসেন নি, কি হল—সে খবরটা পর্য্যন্ত নেওয়া দরকার মনে করেন নি—এমনি এঁদের প্রাণ!—আর সেই খবর লোকের মুখে পাবামাত্র নলিন তার মাকে নিয়ে এসে যে কি সেবাই কচ্ছে, তা এক মুখে বলা যায় না।...এই-মাত্র ডাক্তার এসে ভরসা দিয়ে গেল। এবার দেখবো তাদের বিপক্ষে

দাঁড়িয়ে লড়াই করতে পারে কে...! মানুষের ভিতর যে দেবত্বও থাকতে পারে তা আমি আগে বুঝিনি মহেশ! কিন্তু এই নলিনদের দেখে আমার সে ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে।"

এইবার তিনটি প্রাণীরই মুখ লজ্জায় ও ক্ষোভে বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

সার্ব্বভৌম ঠাকুর অপ্রস্তুতের একশেষ হইয়া রসিক চক্রবর্ত্তীর পানে চাহিলেন। রসিক কহিলেন—"ডাইনীর মায়া, সাভ্যোম দা, সবই ডাইনীর মায়া!...নইলে—এই সব ধর্ম্মপরায়ণ লোকগুলোর মাথা খেয়ে দিতে কি কেউ পারে!...ঐ যে পায়ে জুতো, আর এণ্টাকিন্,—হাতে চুড়ী-বালার বদলে ফিতে জড়ানো ঘড়ি, আর টেনে টেনে কথা বলার ভঙ্গী, ঐতেই সব কর্ত্তাদের মাথা ঘুরে গেছে!"

মহেশনন্দী বিরক্তির সুরে বলিয়া উঠিলেন—"ছি!"

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতার গঙ্গায় সেই জলেডোবার পর হইতেই নরেন ও নলিনের স্নেহের বন্ধনের ভিতরে কোথাও যেন আর একটু মাত্রও ফাঁক থাকিল না। আবার রাধিকাপ্রসাদ ও নলিনের পিতা ভবতারণের ভিতরেও, উক্ত ঘটনা হইতে যে আত্মীয়তার বন্ধন দিন দিন দৃঢ়তর হইতে সুরু হইয়াছিল, তাহা তর্করত্নের সহায়তায় এমন অটুট ও অচ্ছেদ্য হইয়া গেল যে, তাহার ফলে, সে অঞ্চলে ভবতারণের প্রতিষ্ঠাই যে শুধু বাড়িয়া উঠিল এমন নয়, যাহাতে তিনি সকলের সঙ্গে মেলা-মেশা করিয়া—সেখানে ঘর-বাড়ী করিয়া স্থায়ী হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিতেও রাধিকাপ্রসাদ বিরত রহিলেন না।

এদিকে, যে সব ছেলেরা বাড়ীর অভিভাবকদের ভয়ে ইতিপূর্ব্বে নলিনের সঙ্গে মিশিতে সাহস করিত না, তাহারাও অবাধে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইল।...রাধিকা বাবুর পত্নী নলিনকে এমনি সুনজরে দেখিলেন যে, আপনার ছেলেপুলেদের সঙ্গে তাকে আর এতটুকু তফাত করিয়া রাখিতে পারিলেন না

আর নরেনের পিসির তো কথাই ছিল না। তিনি এই দুটি ছেলের ভিতরে বরং নলিনের প্রতিই স্নেহের পক্ষপাত অধিক প্রকাশ করিয়া তাঁহার শেষ জীবনের বিরাট কৃতজ্ঞতার ঋণ কতক পরিমাণে পরিশোধের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এমনি করিয়া, হিন্দুসমাজের সংস্পর্শে আসিয়া—বছর খানেকের ভিতরে নলিন অনেকটা সেই রকম ভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেও, তার পিতা, পুত্রের

কার্য্যে বাধা দিলেন না। কিন্তু মাতা কমলবাসিনী ইচ্ছাসত্ত্বেও বলিবার সাহস পাইলেন না। গ্রামের ধনী রাধিকাবাবুর চেষ্টা ও আনুকূল্যে কমলবাসিনী নিজের নামে যে ছোট-খাট মেয়ে ইস্কুল স্থাপন করিয়া মেয়েদের শিক্ষার পথ সুগম করিতে সুরু করিয়াছিলেন, সেই ইস্কুল ক্রমেই যেরূপ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল, তাহাতে তাঁহার অন্তঃরের অন্তস্থলে প্রতিনিয়তই অদূর ভবিষ্যতের একখানা চমক্‌প্রদ চিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চক্‌ চক্‌ করিয়া উঠিত।

কিন্তু ভবতারণ যখন রাধিকাবাবুর ইচ্ছাক্রমে কলিকাতায় গিয়া তাঁহার পূর্ব্ব কার্য্যে ইস্তফা দিয়া আসিলেন, তখন কমলবাসিনী আর কিছুতেই মনের কথা চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া ক্ষুব্ধ ভাবে স্বামীকে বলিলেন—"এখানে ক্রমাগত হিন্দুদের সঙ্গে মিশে নলিন ক্রমেই যে ওদের চালচলনে অভ্যস্ত হয়ে উঠ্‌ছে—সেটুকু লক্ষ্য করেছ কি? আমাদের ছেলে,—তার পক্ষে আমাদের সামাজিক বিধিগুলি কত কঠোর ভাবে মেনে চলা দরকার, তা—"

ভবতারণ প্রশান্ত স্বরে কহিলেন—"তার চেয়ে প্রকৃত মানুষ হবার চেষ্টা করাই সকলের বেশী দরকার। উদারতা, আত্মদান, পরসেবা, ও মনুষ্যত্বের কাছে—আমাদের সমাজের গণ্ডীরেখাগুলি দলিত হলেও, তাতে ধর্ম্মহানির আশঙ্কা নেই।......ঈশ্বরের অনুগ্রহে নলিন আমার সর্ব্বদা উচ্চ আদর্শে চলে যথার্থ মানুষ হোক। তাতে যদি সমাজ তাকে কোলে নিতে কুণ্ঠিত হয়, তবে তেমন সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক না থাক্‌লেও আমরা দুঃখিত হব না।" বলিতে বলিতে ভবতারণের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কিন্তু কমলবাসিনীর যেন বাক্‌রোধ হইয়া গেল! স্বামীর মুখে এমন কথা তিনি জীবনে আর কখনো শুনিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। বরং যে ভবতারণ—ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, নিতান্ত দরিদ্র হইয়াও, প্রকৃত ব্রহ্মভক্ত বলিয়া যাঁহার

সমাজে অন্য সকল লোকের কাছে প্রচুর প্রতিপত্তি ও সম্মান ছিল, সারা বাংলা দেশ ঘুরিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের একাধিপত্য প্রচারের জন্য যিনি প্রাণপাত করিতেও ছাড়িতেন না, এবং হিন্দু সমাজের নানা কুসংস্কার দোষ দেখাইয়া নিয়ত গলাবাজি করিতে নিরস্ত হইতেন না, তাঁহারই মুখে এই অত্যাশ্চর্য্য মন্তব্য শুনিয়া কমলবাসিনী যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। হঠাৎ মুখে কথা যোগাইল না, শুদ্ধ বিস্ময়াকুল নীরব দৃষ্টিতে পতির মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

পত্নীর মনোভাব বুঝিয়া ভবতারণ মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"দেখ, কোন মানুষই যেমন দোষশূন্য—সম্পূর্ণ—আদর্শ নয়, তেমনি কোন ধর্ম্ম-সমাজই একেবারে নির্দ্দোষ—শ্রেষ্ঠ নয়। দোষ গুণ সমান ভাবে সকল সমাজেই আছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করলে তা দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে, সকল ধর্ম্ম-সমাজের লক্ষ্যই যখন একই বস্তু, তখন পরস্পরের দোষ ভুলে—গুণের ভাগটুকু নিয়ে—যদি আমরা ভাই ভাই একসঙ্গে মিশে যেতে পারি, তা'হলে দেশের উন্নতি যেমন অপরিহার্য্য হয়ে উঠ্‌তে পারে, আমরাও তেমনি পরস্পরের ধর্ম্মপথে অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারি। তা না করে—স্বার্থের প্রলোভনে—মুখে শুধু ধর্ম্মের মুখোস এঁটে পরস্পরের খুঁৎ ধরে, দলাদলি করে, সকল সমাজই ক্রমে অধঃপতিত হচ্ছে। আর তাতে দেশের যে কি সর্ব্বনাশ আমরা করছি তা বলতে পারি না।...একই দেশে, ভাই ভাই হয়েও—একই সনাতন ধর্ম্মের বিস্তার ও রক্ষা করতে গিয়ে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে ক্রমেই তফাৎ হয়ে পড়ছি। এতে দেশের যেমন বলহানি আর অবনতি হচ্ছে, ধর্ম্মেরও তেমনি অপকার হচ্ছে।...ধর্ম্ম কোন সমাজেরই গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ নয়—ধর্ম্ম মানুষের হৃদয়ে! সেই হৃদয় নির্ম্মল করে, ভাবের ঘরখানি পরিষ্কার রেখে যিনি সকলকে সমান ভালবেসে আলিঙ্গন করতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মপ্রচারক

হবার যোগ্য।...যতদিন তেমন না হতে পারা যায়, ততদিন এ কাজে প্রত্যবায় আছে! তাই আমি প্রচারকের কাজে ইস্তফা দিয়েছি!...দেশের মঙ্গল—ধর্ম্মের উন্নতিতে, আর ধর্ম্ম—প্রেমে, হিংসায় নয়! সেইজন্য অনুরোধ করি—প্রেমপূর্ণপ্রাণ ছেলেকে তুমি সমাজের ভয়ে সত্য-ধর্ম্মের পথ থেকে ফিরাতে চেয়ো না, তাতে ছেলেকে তো বশে রাখ্‌তে পারবেই না; বরং তোমারই মনের অশান্তি হাজার গুণ বেড়ে যাবে।"

—"কিন্তু ওদের সমাজের গোঁড়ামীগুলো—"

কমলবাসিনীর কথায় বাধা দিয়া ভবতারণ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"গোঁড়ামীর কথা একবারও তুলো না।...ও জিনিসটা—সকল সমাজের ভিতরেই কম বেশী আছে। কিন্তু তাই বলে, খাঁটি জিনিষের অভাবও কোন সমাজে নেই। এই যে, যে সমাজের তুমি নিন্দা করছো, ভেবে দেখ এর মধ্যে মহত্ত্বের এতটুকু অভাব নেই, বরং এদের মহানুভবতার বিরুদ্ধে—"

পতির মনের কথা বুঝিয়া, এবার কমলবাসিনী বাধা দিয়া ক্ষুব্ধভাবে বলিলেন—"না, তত হীন আমি নই, সে কৃতজ্ঞতা আমারও আছে। কিন্তু এখানে স্থিতু হয়েছি যে উদ্দেশ্য নিয়ে, তা তো আমাদের সফল করতে হবে?...যতদিন এখানে অন্ততঃপক্ষে একটা ছোট-খাট রকমের ব্রাহ্ম-পল্লী গড়ে তুলতে না পারা যায়, ততদিন আমাদের স্থায়িত্ব কি বল দেখি? এখন তো ঠিক জলের উপর তেলের মত আমরা ভাসছি, না পারবো এদের ভিতরে মিশিতে—না পারবো এখান থেকে চলে যেতে। কাজেই যখন ঘরবাড়ী করে বসা গেছে, তখন—যা রয়-সয়, তেমনি একটু নিজেদের সমাজের জন্য—নিজেদের দলবলের জন্য টানতে হবে তো?"

—"কিন্তু স্বার্থের দিক্‌টা ভারী করতে গিয়ে অন্যদিক যেন হাল্‌কা না হয়, তাতে ভগবান বিমুখ হবেন। কাজ সদিচ্ছায় করলে তাতে তিনি সহায়

হন।...এই দেখ্‌লে তো, রাধিকাবাবুর সদর-নায়েবীটা আমি নিলুম না বলে, তাঁর কতখানি দয়া লাভ করেছি। প্রথমতঃ, আমাদের পরম হিতৈষী মহেশবাবু চাকরিটা পেলেন, তাতে আমাদের কত সুবিধা হবে। দ্বিতীয়তঃ, আমার উপরে রাধিকাবাবুর শ্রদ্ধা ভালবাসা আরো বাড়্‌লো বই কম্‌লো না। তার ফলে এই যে উপরকারটা তিনি আমার করেছেন—এতো আমাদের মত গরীব লোক স্বপ্নেও কখনো আশা করতে পারে না। কলকাতায় তাঁর তিন লাখ টাকার প্রাসাদ হবে—এ কাজ নেবার জন্যে যে কত বড় বড় সাহেব-কোম্পানী, ইঞ্জিনিয়ার আর নামজাদা ঠিকেদারেরা ঘুরে ঘুরে হায়রাণ হয়ে গেল, তার ঠিকানা নেই, কিন্তু কাউকে দিলেন কি? আমাদের যদি কিছু মূলধন থাকতো, তা'হলে তো আমিই পেতুম। তবুও আমাকে দাঁড় করাবার জন্য—আমারই বাল্যবন্ধু—অনাদি সিকদারকে আনিয়ে, তার সঙ্গে আমাকে আধা বখ্‌রাদার করিয়ে দিলেন। এখন থেকে তার ফার্‌মের নামই হয়ে গেল—"ঘোষ-সিক্‌দার" কোম্পানী। এত বড় সৌভাগ্য আমার হবে তা স্বপ্নেও কখনো কল্পনা করতে পেরেছিলে কি? এই "ঘোষ-সিকদার" কোম্পানীর অর্দ্ধেক বখ্‌রাদার হলুম আমি—এই অন্তভক্ষঃধনুর্গুণ—পথের কাঙাল!—এ ভগবানের কত বড় দয়ার দান বোঝ দেখি!"

কমলবাসিনী আগ্রহভরে প্রশ্ন করিলেন—"তা, লেখাপড়া রেজেষ্টারী হয়ে গেছে?"

—"সব হ'য়ে গেছে গিন্নী, কিছুই বাকী নেই, সামনের হপ্তা থেকেই কাজ সুরু হবে, আর আমাকেও গিয়ে থাকতে হবে—কলকাতাতেই।...এখানে তোমার একলা একটু অসুবিধা হবে বটে, কিন্তু আরো যে একটা সুখবর আছে, তা শুনলে সে অসুবিধা আমলেই আনবে না।"

ভবতারণ একটু মুচকি হাসিলেন, কমলবাসিনী ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি, আর কি?"

—"জানতো, সেই কলেজে পড়বার সময় থেকেই অনাদির সঙ্গে আমার কি রকম প্রণয়? তার উপর আমার কথাতেই, রাধিকাবাবু তাকে নিজে থেকে সেধে এত বড় কাজটা দিলেন। এতে সে ভারি কৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছে,...আমাদের বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতি চিরদিন জাগিয়ে রাখবার জন্য আর একটা আকিঞ্চন জানাতেও ছাড়েনি।"

ভবতারণ অপাঙ্গে চাহিয়া আবার একটু কুটীল হাসিলেন, কিন্তু কমলবাসিনী বিরক্তির স্বরে বলিলেন—"পালা সুরুর আগে থেকেই মানুষকে অস্থির করা তোমার বড় একটা বদ্ অভ্যাস।"

ভবতারণ হাসিয়া বলিলেন—"শুনলে পাছে বেশী অস্থির হও, তাই যে ভয়!...অনাদির মেয়ে বিজলীলতাকে জানতো?"

—"বিজলীলতা?—হ্যাঁ—হ্যাঁ......সেই পাঁচ বছর বয়স থেকে মা-মরা? মেয়েটি নিখুঁত সুন্দরী—চমৎকার! সেবার উৎসবের কদিন আমাকে যেন তার নিজের মায়ের মত করে নিয়েছিল—"বলিতে বলিতে কমলবাসিনী একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলিলেন।

ভবতারণ উৎসাহভরে বলিয়া গেলেন—"এই একটি মাত্র মেয়ে ছাড়া অনাদি বেচারার সংসারে আর আপনার বলবার কেহই নেই।...এত দিন ধরে বুকে তুলে মানুষ করে চোদ্দ বছরেরটি করেছে—বেথুন স্কুলের ফোর্থ ক্লাসে পড়ে। এখন অনাদির আকিঞ্চন যে, আমাদের নন্দিনের সঙ্গে তার বিয়ে দেয়।"

উল্লাসের উত্তেজনায় কমলবাসিনীর মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ভবতারণ স্মিতমুখে ধীরে ধীরে কহিলেন—"সে আমার সম্মতি নিয়ে তবে ছেড়েছে। আমি জানি, আমার ইচ্ছা আর তোমার ইচ্ছা, দুয়ের মধ্যে গরমিল নেই; তাই বাক্যদানও করে ফেলেছি......!...অন্যায় করেছি কি কমল?"

ভবতারণ পত্নীর মুখের পানে এমনভাবে চাহিলেন যে, হর্ষে গর্ব্বে কমলবাসিনীর সারা বুকখানা ভরিয়া গিয়া মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে বাকী থাকিল না। পতির মুখের উপর স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, সহসা নরেন ও নলিন ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকিয়াই মুহূর্ত্তের জন্য থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল। তারপরেই নরেন উল্লাসে প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল—"দেখুন মাসিমা, আমার কথা ঠিক হল কি না? নলিন ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ হয়েছে—এইমাত্র গেজেট এলো।"

কমলবাসিনী যেন আহ্লাদে লাফাইয়া উঠিলেন। ভবতারণ মধুর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার এবার সেকেণ্ড ইয়ার হ'ল না?"

নরেনের হইয়া নলিন তাড়াতাড়ি জবাব করিল—

"হ্যাঁ বাবা, আসছে বছর এমনি দিনে নরেনও 'আই, এস-সি'তে স্কলারশিপ্‌ পাবে—দেখে নেবেন।"

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—"তা'হলে এখান থেকে যাওয়াই ঠিক করলে মা ?"

—"কেন, তোর কি মত নেই ?"

—"আমার কথা নয়, হাঁসপাতালে সবাই জিজ্ঞাসা করছিলো কি না।... তা ছাড়া—"

—"তা'ছাড়া কি ?"

কনকমালা সন্দিগ্ধভাবে মেয়ের মুখের পানে চাহিলেন। তড়িতা, ছেঁড়া কাপড় রিপু করিতে করিতে, মুখ না তুলিয়াই বলিল—"না বলে-না-কয়ে একেবারেই গিয়ে হাজির হবে! শেষে যদি—" তারপর কথাটা শেষ না করিয়াই কাজে মনোযোগ দিল। কনকমালা, মেয়ের মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন—"শেষে যদি ওজোর আপত্তি করে—এই তো ? তাতেই বা আমাদের ক্ষতি কি মা ? আমি তো এখানে এখন রিজাইন্ দিয়ে যাচ্ছি না,...যাবো দু'মাসের ছুটি নিয়ে,...মেম সাহেবকে বলে-কয়ে রাজি করিয়েছি বিশেষ সুবিধে না হয়,—আবার ফিরে আসবো। তবে তোর কিছু ক্ষতি হবে বটে, আর এই কটা মাস হলেই এ বছরের কোর্সটা শেষ হ'ত—"

কনকমালা কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তড়িতা বলিয়া উঠিল—"আমার ক্ষতি কিচ্ছু হবে না মা! এ তো আর তেমন ইস্কুল নয়—প্রাইভেট হাঁসপাতাল, এখানে বেশী কিছু শেখবারও আশা নেই। তবে, আমাদের যাওয়ার কথা শুনে সবাই বলাবলি করছিলো যে, আগে তাদের কাছে চিঠিপত্র লিখে—একটা পাকাপাকি করে গেলেই ভাল হ'ত।"

কনকমালা কন্যাকে বুঝাইতে বলিলেন—"না না—তাতেই বরং খারাপ হতে পারে। এ দশায় যদি তোর হাত ধরে সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে পারি, তা'হলে কমল কখনো আমাদের ফেল্‌তে পারবে না। তুই তো ভাল করে জানিস না মা—কমল আমার কে? ছেলেবেলায় অনেককাল আমরা এক সঙ্গে কাটিয়ে'ছি, সে নিজের খাবার অর্দ্ধেক আমার মুখে তুলে না দিয়ে কখনো একলা খায় নি। এমন কি, ওর বিয়ের দু'বছর পরে পর্য্যন্ত তেমনি টান ছিল। তখন ওর ছেলে পেটে—তেমন অবস্থাতেও, আমার বিয়ের সময়ে আসতে ছাড়েনি।"

তড়িতা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"সেও তো অনেক কালের কথা মা!"

—"হোক অনেক কালের কথা!" বলিয়া, কনকমালা এমন বিশ্বাসের ভরে, শৈশব-সহচরীর সম্বন্ধে দৃঢ়স্বরে কতকগুলি কথা বলিয়া গেলেন যে, তড়িতার হৃদয়ে আর কিছুমাত্র খটকার স্থান রহিল না, সে লজ্জিতভাবে মাথা নীচু করিল।

কনকমালা বলিলেন—"শেষে যখন আমার কপাল পুড়্‌লো, তখন আমিই চিঠি-পত্র লেখা বন্ধ করে দিলুম।...কেবলই একঘেয়ে দুঃখের কথা লিখে লিখে তাকে আর জ্বালাতন করতে ইচ্ছা হয়নি।"

—"আমরা যে এখানে আছি, তা কি তিনি জানেন না?"

—"হাঁ, চার পাঁচ বছর আগে—যখন প্রথমে এখানকার চাকরি নিয়ে আসি, তখন সে খবর তাকে দিয়েছিলুম। কিন্তু তার পরেই শুনলুম যে, তারা 'চাতরা' গাঁয়ে গিয়ে ঘর বাড়ী করে বসেছে—নিজের নামে ওই লেডী স্কুল পর্য্যন্ত করেছে। তারপর আজ চার বছর হয়ে গেছে তাকে আর কোন খবরই দিইনি—"

কনকমালার শেষের কথা গুলা ভারি ভারি শুনাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের জমায়িত অভিমানটুকু চোখ মুখের উপর প্রতিভাত হইল। মায়ের

এই সুপ্ত অভিমান যে সহসা আজ স্মৃতির ঘায়ে জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা তড়িতা এক লহমাতেই বুঝিয়া লইল, মৃদু হাসিয়া কহিল—"এ তোমার মিছে অভিমান মা! আমরা যে আজও এখানে আছি, তা তিনি জানবেন কেমন করে?...চার পাঁচ বছর আগে সেই কবে একখানা চিঠি দিয়েছিলে। তখন তাঁরা চাতরাতে নতুন গিয়ে বাড়ীর ঘর দোর করা—ইস্কুল করা—এই সব কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তাই হয় তো সময় করে তোমার সে চিঠির জবাব দিতে পারেন নি। কিন্তু বুঝে দেখ, তোমারও এত কাল চুপ করে থাকা উচিত হয়নি!...অতখানি বন্ধুত্ব যাঁর সঙ্গে, তাঁর একটা ভুল ক্রটীর জন্যে—"

কন্যার মত আর আপন অন্তরের ধারণা একই ভাবে মিলিয়া যাইতে, কনকমালার মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, উৎসাহ ভরে কহিলেন—"আমি কিন্তু তাদের চিঠি পত্র দেওয়া না থাকলেও খবর রাখি মা!—এখন তারা মস্ত লোক হয়েছে। কমলের ছেলে শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারী পড়ছে, কর্ত্তাও কলকাতার এক ঠিকাদারী আফিসের অর্দ্ধেক বখরাদার হয়েছেন, আর এদিকে কমলবাসিনীর লেডী স্কুল ও খুব জাঁকিয়ে উঠেছে।"

—"ক'জন শিক্ষয়িত্রী আছেন?"

—"তাতো ঠিক জানিনি মা, তবে এখন চারজন নতুন শিক্ষয়িত্রী চাই বলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। তাতেই তো আমি এ[illegible]রে গিয়ে হাজির হতে চাইছি!...বিশেষ করে, ওই 'চাতরায়' যাবার লোভ যে আমি কিছুতেই ছাড়তে পারছিনি মা—" বলিতে বলিতে কনকমালার দু'টি চক্ষু সজল হইয়া আসিল; তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইলেন। কিন্তু কণ্ঠস্বরে বেদনার আভাষ পাইয়া তড়িতা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা মা! এই চাতরাই কি তোমার বাপের বাড়ী—'ঘোলাগাঁর' কাছে?...সে দিন গল্প করছিলে এই গাঁয়ের কথা?"

কনকমালার রুদ্ধ কণ্ঠ হইতে স্বর বাহির হইল না, অতীত স্মৃতির ঘুমন্ত ব্যথাটা তাঁহার কণ্ঠ নালীকে জোরে চাপিয়া ধরিল !...আহা !—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী—

তড়িতা বিস্ময়পূর্ণ নীরব দৃষ্টি তুলিয়া মাতার মুখের উপরে নিবদ্ধ করিতেই, কনকমালা হৃদয়ের রুদ্ধ আবেগকে আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। আর্দ্র কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"আমার বয়স তখন মোটে ছ'বছর। সেই সময়ে আমার ঠাকুরদাদা হিন্দু-সমাজের সম্পর্ক ছেড়ে কেশব সেনের দলে ঢুকলেন। তাঁকে নিয়ে মহামারী কাণ্ড বাধ্‌লো—সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও সর্ব্বস্ব গেল, ঘোলা-গাঁ ছেড়ে পালাতে হল। সেই থেকে বাবাও আর কখনো সে-মুখো হননি। ...কিন্তু মা, জন্মভূমির নামের সঙ্গে যে কি মোহ জড়ানো আছে তা বলতে পারিনি।...জ্ঞান হবার পরে থেকে আমার মন কেবল সেই দেশের বুকে ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে !...যেদিন থেকে শুনেছি যে কমল গিয়ে চাতরায় ঘর-বাড়ী করেছে, সেই দিন থেকে এই চার পাঁচ বছরের মধ্যে আমার বিশ্রামের সময় অন্য চিন্তা আসেনি তড়ি,—ভেবেছি, কবে কতদিনে জন্মভূমির কোলে ফিরে যাবো !"

তড়িতা, এই ইতিহাসের মোটামুটি ব্যাপার জানিলেও, মূল কারণ জানিত না, এক্ষণে মাতার মুখে সেই বিবরণ শুনিয়া বিস্ময় ভরে কহিল—"এ কথা তো এত দিন আমায় বল নি মা !...গাঁয়ের লোকের অত্যাচারে তোমার ঠাকুরদাদাকে যেখান থেকে সর্ব্বস্ব খুইয়ে পালাতে হয়েছিল, সেই গাঁয়ে যাবার জন্য তোমার আবার মন টানে ?"

একটা ম্লান হাসি হাসিয়া কনকমালা কহিলেন—"ভুলে যাস্‌নি তড়িতা—সে যে জন্মভূমি !—স্বর্গের চেয়ে বেশী বাঞ্ছা করা !"

মেয়ে কথা কহিল না। কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, মা

কথাটা ঘুরাইয়া বলিলেন—"তা' ছাড়া, তোর ভবিষ্যতের একটা হিল্লে করে দিতে না পারলে যে মরেও আমি শান্তি পাব না।...কমলের ওই এক মাত্র ছেলে ছাড়া অন্য সন্তান নেই, এই বেলা তোকে তার হাতে যদি গছিয়ে দিতে পারি—"

মেয়ে বিরক্তির সহিত বাধা দিল—"ফের যদি অমন কথা বলবে তো আমি কক্ষনো যাব না।"

—"বেশ, তুই তা'হলে এখানকার হাঁসপাতালে ধাত্রী হয়ে থাক্, আমি কমলের কাছে গিয়ে থাকি, কেমন ?" বলিয়াই কনকমালা ঠোঁটের আড়ে ঈষৎ হাসি চাপিলেন।

তড়িতা, মুখ না তুলিয়াই জবাব করিল—"বেশ তো, যাওনা—মানা করছে কে ?···কিন্তু, যখন অপমান হয়ে ফিরে আসতে হবে, তখন আমি অমনি ছাড়বোনা—তা ব'লে রাখছি।"

এবার কনকমালা মধুর হাসিয়া বলিলেন—"কিন্তু গিয়ে, তখন যদি তুই ফিরে আসতে না চাস্ তা'হলে কি হবে ? কমল তেমন মানুষ নয়—কখনো একলা থাকতে পারে না—দুনিয়ার লোকের সঙ্গে যেচে ভাব করে বেড়ায়।...তার ছেলে রয়েছে শিবপুরের কলেজে, আর কর্ত্তাকেও কাজের ঝঞ্ঝাটে বাইরে ঘুরতে হচ্ছে, এখন তোকে পেলে সে কি আর ছেড়ে দেবে ভেবেছিস ?"

* * * বাস্তবিকই, কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়। ভবতারণ যখন "ঘোষসিক্‌দার" কোম্পানীর অংশীদার হইয়া, বেশীর ভাগই কলিকাতায় কাটাইতে লাগিলেন, এবং নলিনকেও—কলেজে ভর্ত্তি হইবার পরে অনাদিবাবুর আগ্রহে, কলিকাতায় তাঁহারই বাড়ীতে থাকিতে বাধ্য হইতে হইল। তখন কমলবাসিনীর বড়ই ফাঁকা-ফাঁকা—একা-একা ঠেকিতে লাগিল। এক দিকে যেমন নিজের ঘর-বাড়ী ফেলিয়া যাইবার উপায় রহিল

না, অন্যদিকেও তেমনি, তাঁহার লেডীস্কুলটা এতই উন্নতির পথে চলিয়াছিল যে, সেদিকেও মনোযোগ অর্পণ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।...

কমলবাসিনী বছর তিন চার ধরিয়া কেবলই অস্থায়ী ভাবে সহকারী শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে যেমন অর্থব্যয়, তেমনি নানা গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। শেষে, যে বছর পরীক্ষার্থী ছাত্রীর সংখ্যা আশার অতিরিক্ত হইয়া বাড়িয়া উঠিল, তখন তিনি চারিজন স্থায়ী শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করিয়া স্কুলের সুবন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গে, আপনার দল বৃদ্ধি এবং নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতা পূর্ণ করিয়া লইবার চেষ্টায় লাগিয়া গেলেন।...

...স্কুলের তখন ছুটী ছিল। কমলবাসিনী সপ্তাহ খানেকের জন্য কলিকাতায় চলিয়া গিয়া, শুধুই যে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন এমন নয়, ফিরিবার সময়ে দুইজন শিক্ষয়িত্রীকেও বাহাল করিয়া আসিলেন। কিন্তু গৃহে ফিরিবামাত্র সহসা একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে শৈশবসহচরী, জীবনের দোসরোপম কনকমালাকে দেখিয়া তাঁহার আর বিস্ময় ও আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না।

কমলবাসিনীর যেন নিজের চক্ষুকেই বিশ্বাস হইতেছিল না, ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া সহসা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"কনক—তুই!"

কনকমালা নীরবে চক্ষু মার্জ্জনা করিতেছিলেন। সুদীর্ঘ অতীত-জীবনের তাবৎ শোকদুঃখ-দারিদ্র্যের পুঞ্জীভূত অশ্রুরাশি, তুষারের মত জমাট বাঁধিয়া, যে বুকখানার ভিতরে স্তরে স্তরে চাপিয়া বসিয়াছিল, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে—আজ এই শৈশব-সহচরীর সম্মুখে আসিয়া, তাঁহার স্নেহোষ্ণ মিলনের সংঘাতে—তাহা ভাঙিয়া চুরিয়া গলিয়া গিয়া, দুই চক্ষু ভেদ করিয়া শত ধারায় ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল।...কমলবাসিনী তাঁহার হাত ধরিয়া বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন—"যদি এতকাল পরে আবার দেখা

দিলি বোন্—"বলিয়াই, হঠাৎ থামিয়া গিয়া পাশের দিকে চাহিয়া, বিস্ময়ভরে প্রশ্ন করিলেন—"এটী কে রে—মেয়ে নাকি?"

কনক ধরাগলায় তড়িতার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তোর মাসীমাকে প্রণাম কর তড়ি—"

তারপর সখীর প্রতি ফিরিয়া কহিলেন—"হ্যাঁ ভাই মেয়ে, আমার ভাঙা কুঁড়েয় চাঁদের আলো!"

তড়িতা, নিতান্ত জড়সড় হইয়া একেবারে যেন মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া প্রণাম করিতেছিল। কমলবাসিনী তাড়াতাড়ি তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন। এবং চিবুক ধরিয়া মুখের পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে, আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন—"চাঁদের আলোই বটে ভাই!......আয় মা, আজ থেকে আমার আঁধার ঘর আলো করে রাখবি।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

* * * মাস ছয়েক পরে বাৎসরিক পরীক্ষান্তে বাড়ী আসিয়া, নলিন তড়িতাকে দেখিয়াই বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল! কমলবাসিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ওকি রে—অমন অবাক্ হয়ে দেখছিস কি? ও যে আমাদের আপনার জন—তোর সেই কনক-মাসীর মেয়ে 'তড়িতা'!... কেমন সঙ্গীটী তোর জন্যে রেখেছি বল দেখি?"

নলিনের মুখখানা রক্তাভ হইয়াই নত হইয়া পড়িল, কিন্তু কমলবাসিনী তরল হাস্যে কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া কহিলেন—"অত লজ্জা কর্‌ছিস কাকে দেখে? ওরা তো পর নয়, কনক আমার ছেলেবেলার সই—নিজের বোনের মত। তুই এদিকে যে অনেকদিন বাড়ী আসিসনি জানবি কি করে!... কনক আমাদের লেডী-স্কুলে টিচারি করছে, আমাদের বাড়ীতেই আছে—থাকবেও বরাবর।...তাকে তো আর অন্য শিক্ষয়িত্রীদের মত ইস্কুলবাড়ীতে ঘর দিয়ে রাখতে পারিনি? আজকাল সে-ই তো সংসারের গিন্নী! আমাকে আর সংসার নিয়ে কোন কিছুই ভাবতে হয় না।"

কলিকাতার কলেজে পড়িবার সময় হইতেই, অনাদিবাবুর আগ্রহে এবং তাঁর কন্যা বিজলীবালার আকর্ষণে, নলিনের আর তাঁহাদের বাড়ী ছাড়িয়া গৃহে আসা বড় একটা ঘটিয়া উঠিত না। অনন্তর শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হইবার পরও প্রত্যেক ছুটীতেই অনাদিবাবু আগে হইতে লোক পাঠাইয়া, তাহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজের বাড়ীতে রাখিতেন এবং সমস্ত অবকাশের কালটা—সারাদিন তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া কাজকর্ম্ম

২১।১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

বুঝাইয়া শিখাইয়া বেড়াইতেন। তারপরে, সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরিয়া, মেয়ের উপরে তাহার আতিথ্যের ভার অর্পণ করিয়া, যখন নিজে বিশ্রাম করিতে যাইতেন, তখন সেই সুশিক্ষিতা কিশোরী পড়ায়, গল্পে, গানে, বাজনায়, হাসিতে, আনন্দে, যুবকের চারি পাশে এমন একটা স্বপ্নময় সৌন্দর্য্যের রাজ্য বিস্তার করিয়া রাখিত যে, তাহার মোহ কাটাইয়া নলিনের আর বাড়ী যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। এমন কি বাড়ীর কথাই ভুল হইয়া যাইত!...এমনি করিয়া করিয়া শেষে যখন তাহার দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল, তখন সে আর কিছুতেই একবার বাড়ী না আসিয়া থাকিতে পারিল না।...

...নলিন স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই যে, তাহার সেই অনুপস্থিতি কালের ভিতরে, কত বড় বিস্ময়ের ব্যাপার তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল! তাই, সহসা সৌন্দর্য্যের রাণী তড়িতাকে দেখিয়া, আপন বিমুগ্ধ নয়নদুটাকে কোনরকমেই বশে আনিতে পারিল না। তার মনের ভিতরে কেবলই প্রশ্ন উঠিতে লাগিল—কে এ, কোথা হইতে আসিয়া তাহার চির অধিকৃত স্নেহের গণ্ডীর ভিতর এমন অনায়াসে নিজের আসনখানি বিছাইয়া লইয়াছে!

এ যেন—নিত্যদৃষ্ট, অথচ চির-অপরিচিত! কলিকাতায় অনাদিবাবুর গৃহে, বিদ্যুতের মত তীব্র রূপের ছটা বিস্তার করিয়া, যে বিজলীলতা নিশিদিন তাহার চক্ষু ধাঁধিয়া বেড়াইত, এ যেন ঠিক তাহারই প্রতিচ্ছবি—নলিনের নিজের অন্তরের রুদ্ধ দ্বার ভেদ করিয়া—তাহারই অভ্যর্থনার জন্য, আগে হইতে আসিয়া, প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে!

অথচ—এত সাদৃশ্য সত্ত্বেও—দুজনের প্রভেদ কত! সেই বিদ্যুদ্দাম্-স্ফূরিত জ্বলন্ত চাহনি, এখানে কী শান্ত—স্নিগ্ধ, করুণা-প্রার্থনার উৎসৃষ্ট!...সেই প্রখর রূপের জ্বালা এখানে কি শ্যাম-স্নিগ্ধ—সম্মোহন! সেই

লীলাচঞ্চল উচ্চ হাস্যোচ্ছ্বাস এখানে অর্দ্ধস্ফুট গোলাপের মত নীরব, অথচ —কী মদিরা-মাখানো বিহ্বল!...সেই সদাচঞ্চল গতিভঙ্গী কি শান্ত—মৃদু—গম্ভীর!

নলিন প্রস্তর মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া গেল! এমনি সময়ে মা আসিয়া যখন বিস্ময় ভাঙিয়া দিলেন, তখন সহসা অপ্রতিভ হইয়া লজ্জায় মুখ তুলিতে পারিল না। কমলবাসিনী দোরের কাছে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন—"কন্‌কি, ও কনক!—করছিস কি?...নলিন এয়েছে যে রে—"

মায়ের কথায় নলিনের লজ্জানত মুখের উপরে রক্তরাগ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, পরক্ষণেই এক অপরিচিত অথচ সুমধুর কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল—

—"এই যে ভাই, আমার নলিনের জন্যে খাবার করে নিয়ে এলুম!"

বলিতে বলিতে কনকমালা, ঘরের ভিতর আসিয়া, টেবিলের উপরে খাবারের থালা নামাইয়া রাখিলেন, তারপরে নলিনের সম্মুখে আসিয়া মুহূর্ত্তকাল নির্নিমেষ নেত্রে তাহার মুখের পানে চাহিয়াই, সহসা করাঙ্গুলিতে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া গভীর স্নেহে বলিয়া উঠিলেন—"এমন সোণার চাঁদ আমায় ফাঁকি দিয়ে এতকাল একলা দখল করছিলি ভাই!" তারপর কন্যাকে ডাক দিলেন—"তড়ি—ও তড়ি! শীগ্‌গীর হাত মুখ ধোবার জল আন্ না পোড়ারমুখি!...বাছার খাবার জুড়িয়ে গেল যে!"

নলিনের মুখখানা ভয়ানক লাল হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি কনকের পায়ের গোড়ায় টিপ্ করিয়া একটা গড় করিতেই—কমলবাসিনী স্মিতমুখে কহিলেন—

"নলিন আমার এ কালের ছেলেদের মত নয় ভাই, বড় লাজুক আর খুব শান্ত—"

...তড়িতা যে কোন্ ফাঁকে সরিয়া পড়িয়াছিল, কেহই লক্ষ্য করে নাই।

মায়ের আহ্বানে লজ্জাবনতমুখী কিশোরী জলের গেলাস হাতে করিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া পাশটিতে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। দেখিয়াই কমলবাসিনী মধুর কণ্ঠে কহিলেন—"এই যে এসেছ মা! কিন্তু তুমিও অমন নলিনের মত লজ্জায় জড়সড় হ'য়ে রইলে কেন মা? এযে তোমারই ঘর-দোর,...বুড়ো হয়ে পড়লুম আমরা, এখন থেকে নলিকে দেখা-শুনো আদর-যত্ন করবার ভার যে তোমারই ওপর!" তারপরে ছেলেকে বলিলেন—"তড়িতাকে তো তুই আগে জান্‌তিস্‌নে নলিন, ও বড় ভাল মেয়ে। লেখাপড়াও খুব ভাল শিখেছে—বেশ বন্‌বে তোর সঙ্গে। দু'টিতে মিলে-মিশে দিন কাটাতে পারবি।...আচ্ছা এখন তোরা দু'জনে বসে আলাপ-পরিচয়, গল্পগুজব কর, আমরা রাত্তিরের খাবার তৈরী করিগে।...এখুনি আমায় আবার প্রাইজের লিষ্ট্ খানা নিয়ে একবার বেরুতে হবে।...আয় কনক!"

কনকমালা একবার নলিনের ও একবার মেয়ের মুখের পানে আড়ে চাহিয়া কমলবাসিনীর পশ্চাদনুসরণ করিলেন।...

...সন্ধ্যার পরে আহার করিতে গিয়া, নলিন এমন লঘুচিত্তে মা ও মাসীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা জুড়িয়া দিল যে, কমলবাসিনী আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন! তিনি ভাবিয়া পাইলেন না যে, কি মন্ত্র-কুহকে, তাঁহার জড়সড় প্রকৃতির চিরকেলে লাজুক ছেলেটি হঠাৎ এমন সপ্রতিভ ও সামাজিক হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু কনকমালা বুঝিলেন যে—আর যাই হোক মেয়েমানুষের যেটা প্রধান ধর্ম্ম—নিমিষের ভিতরে পরকে আপন করিয়া লইবার শক্তি, তা তাঁর মেয়েটির যথেষ্টই আছে! সেই সঙ্গে তাঁহার অন্তরের অতি অভ্যন্তর প্রদেশে একটা আশার আলো চিক্‌মিক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

মনের আনন্দ-উত্তেজনার আধিক্যবশতঃ কনকমালা, নলিন আহারে বসিলে মাছের কালিয়াটার একটুখানি মাত্র গৃহিণীর জন্য রাখিয়া বাকী

সমস্তটুকুই পাত্র উজাড় করিয়া নলিনের পাতেই ঢালিয়া দিলেন। কমল-বাসিনী স্নেহের ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন—"ও কি হলো? সব কালিয়া যে নলিনের পাতেই ঢেলে দিলি, আর কি কেউ খেতে নেই? তুই নয় না খেলি, মেয়েটা আমার একটু মুখে দিতে পাবে না?"

কনকমালা মৃদু হাসিয়া জবাব করিলেন—"ওর আজ আমোদে পেট ভরে গেছে, নুন ভাত হলেও ওর অপত্তি নেই।"

মাতার কথায়, হঠাৎ তড়িতার আবেশ-রাঙা মুখখানার উপরে, কে যেন এক আঁজ্‌লা রক্ত মাখাইয়া দিয়া গেল। তীব্রকটাক্ষে একবার মায়ের মুখের পানে চাহিয়াই, সে অন্যত্র ছুটিয়া পলাইল।

কিন্তু, তড়িতার এই লজ্জার অভিনয়টুকু—কমলবাসিনীর চক্ষু এড়াইল না। নলিন গৃহে পদার্পণ করিয়াই যে, মুহূর্ত্তের ভিতরে এই অপরিচি-তাদের মন হরণ করিয়া, তাহাদের প্রিয়বস্তু হইয়া উঠিয়াছে, ইহাতে এক অনির্ব্বচনীয় পুলকের ঘায়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল, এবং সেই আনন্দের আতিশয্যে, তিনি তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ছাড়িয়া এই আশ্রিতা দু'টির প্রতি এত বেশী কোমল হইয়া উঠিলেন যে, লঘুচিত্তে বাল্য সহচরীকে ধম্‌কাইয়া বলিলেন—"তোর মরণ হয় না পোড়ারমুখি!... এমন একচোখো মা তো জগতে কোথাও দেখিনি,!—কেন, মেয়ে বলে, বাছা আমার বানের জলে ভেসে এয়েছে নাকি?...দেখি তোর হেঁসেলে আর কোথায় কি আছে?...দে—ও সব আমার তড়িতাকে দে। নুন-ভাত খেতে হয়, তুই খেয়ে মরগে যা,...বালাই—বালাই—সে কেন খেতে যাবে লা?"

বলিতে বলিতে, কমলবাসিনী, নিজে হেঁসেলের ভিতরে গিয়া ঢুকিলেন। কনকমালা ঈষৎমাত্র হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। আহারের সময়ে কমল-বাসিনী, তড়িতাকে কাছে বসাইয়া, ভাল ভাল খাদ্যগুলি তাহাকে খাওয়াইলেন

এবং নিজে প্রায় অর্দ্ধাশনে উঠিয়া গেলেন। কিন্তু তাহাতেই, সে রাত্রে যেমন তৃপ্তি অনুভব করিলেন, তেমন আর কখনো হইয়াছে বলিয়া মনে পড়িল না। কিন্তু তড়িতা বড় লজ্জা পাইল।

শয়নের পূর্ব্বে নলিন আপনার কক্ষে—টেবিলের সাম্‌নে বসিয়া তড়িতার সঙ্গে পড়ার কথা বলাবলি করিতে করিতে রাত বারটা বাজাইয়া দিল। তারপরে মায়ের স্নেহের ভৎ র্সনায় যখন শুইতে গেল, তখন ঘুম যেন আর কিছুতেই আসিতে চাহিল না। সারা রাত্রি ধরিয়া তাহার নিদ্রাবিহীন চোখ দু'টির সম্মুখে একবার বিজলীলতার আর একবার তড়িতার মনোহারিণী ছবি জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আজ ক্লান্ত চোখদুটিকে সে যেন কিছুতেই বিরাম দিতে চাহিতেছিল না! আজ তার বুভুক্ষু অন্তর কাহাকে চাহিয়া ফিরি-তেছে? পুরাতন বিজলীকে, না—হঠাৎ পাওয়া নূতন এই তড়িতাকে! সে কাহাকে পিয়াসী বুকের সকল আকর্ষণ দিয়া একান্তে আপনার করিয়া লইবে—কোন্ আকাঙ্খিত বাঞ্ছিতাকে!...তাহার মরম খুলিয়া গিয়াছে—আজ কোন্ যাদুকরীর সোণার কাঠির কুহক পরশ পাইয়া!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দ্বিতলের সজ্জিত কক্ষে, উন্মুক্ত বাতায়ন সম্মুখে বসিয়া বিজলীলতা—হারমোনিয়াম বাজাইয়া গাহিতেছিল—

"এস প্রাণ সখা এস প্রাণে,
মম দীর্ঘ বিরহ অবসানে।"

অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে কিন্তু সে দিকে তার লক্ষ্য নাই। নীচের ফুলবাগান হইতে সদ্য-ফোটা বেল যুঁয়ের গন্ধ বহিয়া আনিয়া, মৃদু বাতাস, ললাটের উপর বিক্ষিপ্ত কুঞ্চিত অলকদাম্ নাচাইতেছিল, এবং দক্ষিণের মুক্ত গবাক্ষ পথে সপ্তমীর চাঁদের অনাবিল রজত-কিরণ-রেখা ঘরে ঢুকিয়া মেঝের কার্পেটের উপরে আহ্লাদে লুটোপুটি খাইতেছিল।...বিজলী আপন ভুলিয়া গাহিয়া চলিয়াছে—

"ওই জ্যোৎস্না গর্ব্বিত শর্ব্বরী,
ওই পাণ্ডুর তারকা পুঞ্জ,
ওই ধরণী শ্যামলা সুন্দরী,
ওই নীল নিভৃত নিকুঞ্জ।"

সহসা কক্ষদ্বারে প্রমোদভরা কণ্ঠের তরল হাস্যধ্বনি উঠিল। বিজলী তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া চাহিতেই, আগন্তুকের চেহারাখানি তার নজরে আসিল। নম্রভাবে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—"আসুন!"

আগন্তুক আগ্রহভরে কহিল—"এন্‌কোর—উঠোনা, উঠোনা—এন্‌কোর!"

কিন্তু বিজলী ঘাড় বাঁকাইয়া কৃত্রিম কোপভরে বলিল—"যান, খালি

আপনার ঠাট্টা! কতক্ষণ থেকে এমন চোরের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন, একটা খবরও তো দিতে হয়?"

আগন্তুক হাসিয়া বলিল—"বলে-কয়ে চুরি করা আর্টের হিসাবে খুব চমৎকার জিনিস হ'লেও, নতুন চোরের তা সাহসে কুলোয় না। কিন্তু ভা-রি মাহেন্দ্রক্ষণে আজ পা বাড়িয়েছিলুম দেখছি। বাড়ীতে ঢোক্‌বা-মাত্রেই, স্বর্গের সঙ্গীত কাণে ঢুকে, আমাকে দিশেহারা করে তুলেছিল! সকাল বেলায় আজ যে কার মুখ দেখে বিছানা ছেড়েছি সেটা যদি মনে থাক্‌তো, তা হ'লে এক্ষুণি সে বেচারীকে পেটপূরে ভীমনাগের সন্দেশ খাইয়ে দিতুম।...আহা! গান তো নয়, যেন সুধাবরিষণ! সত্যি বিজু, তুমি যে এমন চমৎকার গাইতে শিখেছ—"

বিজলীর মুখখানা গোলাপের মত লাল হইয়া উঠিল, বাধা দিয়া সঙ্কুচিত ভাবে কহিল—"এ আপনার ভারি অন্যায় কিন্তু, কতক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে কষ্ট পেয়েছেন, অথচ—"

—"হ্যাঁ ভারি কষ্ট পেয়েছি, এমন কষ্ট যদি রোজ পাই, তা হ'লে আমি জগতের সুখ জিনিসটাকে মোটেই পছন্দ করিনে।"

—"যান যান, আর কথায় কাজ নেই।" বলিয়া বিজলী এবার সঙ্কোচ দূর করিয়া, অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল—"ডাক্তার হলেই মানুষের মন থেকে দয়া-মায়া গুলো যেমন উপে যায়, তেমনি তাদের কথারও বিন্দুমাত্র ঠিক থাকে না। এ যে—ডাক্তারি-বিদ্যার ধর্ম্ম, আপনিই বা তা থেকে বাদ যাবেন কেন?"

—"এ আমার শাপে বর বিজু, তোমার কাছ থেকে যখন এমন সার্টি-ফিকেট পেলুম, তখন ডিগ্রী পেয়ে বেরোবার আগে থাক্‌তেই যে আমার পশার জমে উঠবে তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইলো না।"

—"সত্যি কথাই তো! বাবা বলছিলেন—নরেন বাবুর মত চোখের

ব্যায়রামে এত নাম কেউ করতে পারেনি। তবে দুঃখ এই যে—চোখের মাথা না খেলে, এর পরে আপনার দেখা মেলা ভার হয়ে উঠ্‌বে।"

নরেন্দ্র হাসিয়া বলিল—"তোমার ভবিষ্যদ্বাণী অন্যের পক্ষে সত্য হলেও, এ ক্ষেত্রে সে ভয়ের কারণ নেই। জোড়ের পায়রার একটাকে যখন ধরে আট্‌কে ফেলেছ, তখন আর একটা আর পালাবে কোথায়? তাকে আপনা থেকেই এসে হাজির হ'তে হবে যে?"

বিজলীর কর্ণমূল অবধি যে লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল, তা সেই রাত্রের আলোকেও নরেন্দ্রের দৃষ্টি এড়াইল না। সে মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। কিন্তু বিজলী দমিল না, একটা চাপা আনন্দের প্রবাহ, তলে তলে তাহার হৃদকে নাচাইয়া দিল। কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত কি বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ ভৃত্য ঘরে ঢুকিয়া গরম জলের কেট্‌লি, চা-দানি এবং অন্যান্য সরঞ্জাম টেবিলের উপরে সাজাইয়া দিল। বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"কই, খাবার আন্‌লি নি?"

ভৃত্য দ্রুতপদে বাহিরে গিয়া, পরমুহূর্ত্তেই একথালা খাবার আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল। বিজলী স্বহস্তে চা তৈরী করিতে উদ্যত হইলে—নরেন্দ্র ব্যস্ত ভাবে কহিল—"না না অত ব্যস্ত হ'তে হবেনা; তুমি থামো বিজু!"

বিজলী হাসিয়া বলিল—"দানা না ছড়ালে কি পায়রা ধরা যায়?"

—"রক্ষে কর, আমি কি কুটুম এসেছি যে—"

—"কুটুমের বাড়া! নইলে এই কলকাতায় থেকেও, একবার উঁকি মেরে দেখতে চান্ না যে, আমরা রইলুম কি—"

—"এ কথা তুমি দু'শোবার বলতে পারো!"

আন্তরিক খুসী হইয়া নরেন্দ্র কহিল—"কিন্তু আমারও যথেষ্ট কৈফিয়ৎ আছে। গত পাঁচ-ছ মাসের ভিতরে আমি নিশ্বাস ফেলবারও অবকাশটুকু

পাইনি। কলেজের খাটুনি—হাঁসপাতাল এ্যাটেণ্ড করা—এই নিয়েই দিন-রাত বিব্রত, তার উপর আবার—বাড়ীতে পিসীমার কঠিন ব্যামো—”

বিজলী দুঃখিতও যতখানি হইল অপ্রতিভও ততখানিই হইল। বিমর্ষ হইয়া বলিল—“আজকাল পিসীমা কেমন আছেন?...আগের চেয়ে ভাল তো?”

—“হ্যাঁ অনেক ভাল, তবে বুড়ো বয়সের রোগ—বিশ্বাস নেই তো?... কেন এসম্বন্ধে নলিন তোমায় কিছু বলে নি?”

—“তিনি কোথায় যে বল্‌বেন?” শেষের কথা কয়টি বলিতে গিয়া বিজলীলতার কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল।

নরেন্দ্র অতিরিক্ত ব্যস্ততার সহিত বলিয়া উঠিল—“সেকি—কোথায় সে?”

—“শিবপুরের কলেজে।”

—“তা তো বুঝলুম, কিন্তু কতদিন এখানে আসে নি?”

—“সে অনেক দিন। সেই যে সেকেণ্ড ইয়ারের একজামিন দিয়ে, এখানে না এসে বাড়ী গিয়েছিলেন, তারপর আজ কতদিন গেল কিন্তু—”

—“আশ্চর্য্য! আমি যে তার খবর নেবার জন্য, ফুরসৎ পাবা মাত্রেই তোমার কাছে ছুটে এলুম!”

একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলিয়া, বিজলী অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল—“আশ্চর্য্য—আপনাদের দু'বন্ধুর সবই!...তবে আপনার আসার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে না। তিনি আমাদের খবর রাখতে না চাইলেও, আমরা তাঁর খবর রাখি, বাবা তো নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারেন না?” তারপর মুখখানি নীচু করিয়া ম্লান ভাবে কহিল—“এবার নাকি তাঁর প্রাকৃটিকালের বেজায় খাটুনি আর ঝঞ্ঝাট পড়েছে—”

—“ওঃ, তাই!”—

নরেন্দ্র এতক্ষণে—স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

বিজলী শ্লেষ ভরে কহিল—"আপনার খুব সরল বিশ্বাস বটে, সে জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু জগতে এমন কুটীল মানুষও আছে, যারা এ কৈফিয়ৎ মোটেই বিশ্বাস করতো না।"

নরেন্দ্র হাসিয়া বলিল—"বিশ্বাস-না করুক, কিন্তু প্রমাণ ছাড়া, ভদ্রলোকের নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করলে, ভবিষ্যতে—মানহানির আশঙ্কা আছে।"

—"কিন্তু, যার পক্ষে ওকালতী করছেন, আগে তার হাড়-হদ্দ ভাল করে জেনে না নিয়ে, আসরে নামলে আপনারই হার হবার সম্ভাবনা—এ কথাটা ভুলবেন না।"

নরেন্দ্র, এবার টেবিলের উপরে একটা প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া, দৃঢ়স্বরে কহিল—"আমার বন্ধুর হাড়-হদ্দ আমি যেমন জানি, এমন আর কেউ জানে না। আর যদি কেউ তা জেনেও, মিছিমিছি তার ঘাড়ে দোষ চাপাতে যায়, তা'হলে এক ফুঁয়েই তা ফেঁসে যাবে।" তারপর মৃদু হাসিয়া কহিল,—"ত্মাখ আমরা গোঁড়া হিন্দু. জান তো—আমাদের বিশ্বাসও অনেক রকমের আছে। আজ যে ব্রতচারিণীর অদ্ভুত সাধনার ব্যাপার চাক্ষুস দেখ্‌লুম, আর কানেও শুনলুম, তাতে—মানুষ তো ছার—যমের বাবাও নলিনকে তার আকর্ষণ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।"

নৈরাশ্যের যে কাল মেঘটুকু ক্ষণে ক্ষণে আসিয়া বিজলীর হৃদয়-গগনে চাপিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছিল, নরেন্দ্রের এই কথাতে তাহা নিমিষের ভিতরেই উধাও হইয়া গেল। তার মুখে-চোখে একটা উদ্দাম আনন্দের আভা ফুটিয়া উঠিল। বিজলী, আত্ম-সম্বরণের ব্যর্থ চেষ্টায় অধীর হইয়া সঙ্কোচ ভরে মৃদু কণ্ঠে কি বলিতে যাইতেছিল, সহসা কক্ষদ্বারে পরিচিত পদশব্দে যেন হাঁফ ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত হইয়া দাঁড়াইল। পরমুহূর্ত্তেই অনাদি বাবু ঘরে ঢুকিয়া নরেন্দ্রকে কহিলেন—"এই যে নরেন,......শুনলুম, অনেকক্ষণ থেকে এসে বসে আছ,আমারও কাজের ঝঞ্ঝাট বেজায় পড়েছে।

বিশেষ করে এই নতুন রেললাইনের কনষ্ট্রকশনের কাজটা নিয়ে অবধি আর নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ পাচ্ছি না—ঘুরতে ঘুরতে প্রাণ ওষ্ঠাগত, আর ওদিকে, ভবতারণও,...থাক্, অনেকক্ষণ থেকে [illegible] করে খুব কষ্ট পেতে হয়েছে বোধ করি ?"

অনাদিনাথ একটা আরাম-চেয়ারে হেলান দিয়া, গা ছাড়িয়া দিলেন। বিজলী তাড়াতাড়ি গিয়া, স্বহস্তে বাপের জুতা, মোজা, জামা ছাড়াইয়া লইতে লাগিল।

নরেন্দ্র সঙ্কুচিত ভাবে ধীরে ধীরে বলিল—"আমি তো পরের বাড়ীতে আসি নি—যে কষ্ট হবে !"

মধুর হাসিয়া, অনাদি বাবু কহিলেন—"এবার তোমাকে অনেক দিন পরে দেখলুম।"

—"আজ্ঞে, সময় মোটেই পাই না—"

অনাদি বাবু হঠাৎ না আসিবার কারণটুকু বুঝিয়া লইয়াই বলিয়া উঠিলেন—"ও—হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার এবার ফাইন্যাল একজামিন ! তা ঈশ্বরানুগ্রহে তোমার নাম-যশ এরই ভিতরে যথেষ্ট হয়েছে [illegible]তে পাই, কলেজ থেকে বেরিয়ে আর বেশী বেগ পেতে হবে না। এখন, [illegible]ন আমাদের আর দুটো বছর ভালোয় ভালোয় কাটিয়ে উঠতে পার[illegible]!...ছেলেটা পরিশ্রমও যথেষ্ট করে, এখন বরাত !"

একটা লঘু নিশ্বাস উদাস বাতাসের মত বাহির হই[illegible] গেল। ভৃত্য আসিয়া চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়া দিল এবং বিজলী পিতার জন্য চা প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

নরেন্দ্র মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার শরীর বেশ সুস্থ আছে ?"

—"হ্যাঁ, আমার শরীর উপস্থিত নেহাৎ মন্দ নয়, কাজ কর্ম্মের অবস্থাও ভাল, তবে ভবতারণকে নিয়ে একটু ভাবনায় পড়েছি, এই যা—"

নরেন্দ্র জিজ্ঞাসু হইয়া চাহিয়া রহিল।

চা তৈরী করিয়া দিয়া, পিতার জামা-জুতা প্রভৃতি লইয়া বিজলী কক্ষান্তরে চলিয়া গিয়াছিল। অনাদিবাবু এক চুমুক চা খাইয়া, চিন্তিতভাবে কহিলেন—"এমনি কাজ-পাগলা মানুষ যে, শরীরের দিকে মোটেই নজর রাখে না। জায়গাটাও ভাল নয়, সেই জন্য আমি তাকে পাঠাতে চাইনি। কিন্তু বহুকাল ধরে ধর্ম্ম-প্রচারকের কাজে দেশ-বিদেশে ঘুরে ঘুরে তার স্বভাব এমনি দাঁড়িয়েছে যে, সে আর কিছুতেই এখানে থাকতে পারে না।... তোমাদের বাড়ীটা হয়ে যাবার পর থেকেই, আমাকে এখানকার কাজ-কর্ম্ম দেখবার জন্য রেখে, সে কেবলই বাইরে নতুন নতুন কাজের জোগাড় করে নিয়ে ক্রমাগত বিদেশে-বিদেশেই কাটাচ্ছে। মাঝে-মাঝে আসে বটে, কিন্তু একটা মাসও এখানে থাকতে চায় না—পালাবার জন্যে কেবলই ছট্‌ফট্ করে।"

—"কিন্তু কলকাতার কাজের চেয়ে মফঃস্বলের কাজেই তো আপনাদের বেশী লাভ ?"

—"সে কথা ঠিক, আর এও খুব সত্যি যে, ভবতারণ যদি বাইরের কাজের জন্য এত বেশী না ঝুঁক্‌তো, তা'হলে, আমাদের এই 'ঘোষ-সিকদার কোম্পানীর' কারবার এই ক'বছরের ভিতরে এত আশ্চর্য্য রকম ফেঁপে উঠ্‌তে পারতো না, উন্নতির মূল—সে-ইই। কিন্তু ক্রমাগত বাইরে বাইরে কাটাতে কাটাতে, নানা জায়গার জল-হাওয়ায় তার শরীর যে রকম দিন দিন অসুস্থ হয়ে পড়ছে, তাতে আমার তো একটুও ভরসা হয় না...... বিশেষ ক'রে—এই নতুন কনস্‌ট্রক্‌শনের কাজটায় গিয়ে অবধি কেবলই অসুখে পড়ছে, এত করে চলে আসবার জন্যে লিখছি, কিন্তু এমনি কাজ-পাগলা যে কথা মোটেই গ্রাহ্য করে না।...এই তো—দিন চার আগে চিঠি পেয়েছি যে—জ্বরে পড়েছে !"

নরেন্দ্র চিন্তিত হইয়া কহিল—তা হলে কিছুতেই আর তাঁকে—বাইরে রাখবেন না। যেমন করে হোক এখানে আনিয়ে নিন্।"

—"আমিও তাই ভাবছি যে, নিজে একবার সেখানে যাই, নইলে চিঠি-পত্র লিখে, কি লোক পাঠিয়ে ফল হ'বে না। এ সব কথা বলতে গেলে আমাকেই হেসে উড়িয়ে দেয়, তা কর্ম্মচারী পাঠিয়ে আর ফল কি হবে, কেউ জোর করতে পারবে না তো? তা ছাড়া এখানকার এমনই অবস্থা যে, একটা দিনও আমার নড়বার জো নেই! আফিসের কি অন্য কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা না হয় পাঁচ সাত দিনের জন্য ক'রে যাওয়া চলে,—কিন্তু এই বয়স্থা মেয়েকে একলা ফেলেই বা যাই কেমন করে? চাকর-বাকরদের ওপর এত বড় ভরসা করতে আমার সাহসে কুলোয় না। তাই ভাব্ছি, এ সময় যদি নলিনেরও ছুটী থাকতো—"

ইতিমধ্যে বিজলী একখানা খাম হাতে করিয়া ব্যস্ত ভাবে ঘরে ঢুকিয়াই বলিয়া উঠিল—"দেখ তো বাবা—এতো তোমার আফিসের বলে বোধ হয় না, এমন সময় টেলিগ্রাফ এলো কোত্থেকে!...আমি সই দিয়ে পিয়নকে বিদেয় করেছি।"

অনাদিবাবু উৎকণ্ঠাভরে, তাড়াতাড়ি মেয়ের হাত হইতে খাম খানা টানিয়া লইয়াই, তৎক্ষণাৎ খুলিয়া ফেলিলেন এবং মুহূর্ত্তমাত্র চোখ বুলাইয়াই উদ্বেগাকুল কণ্ঠে প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"সর্ব্বনাশ! যা ভয় করেছি তাই—ভবতারণের কঠিন ব্যামো!"

নরেন্দ্র এবং বিজলী প্রায় একই সঙ্গে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল।

টেলিগ্রাফখানায় চোখ বুলাইতে বুলাইতে অনাদিবাবু আপন মনেই বলিতে লাগিলেন—"তার' করেছে সেখানকার ওভারসিয়ার, ..লিখেছে—Bhabataran seriously ill, come immediately." বলিয়া, টেলিগ্রাফ্‌খানা নরেন ও বিজলীর দিকে আগাইয়া ধরিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দুই সখীতে পরামর্শ ও যুক্তি-তর্ক চলিতেছিল। কমলবাসিনী বলিলেন—"ও সব মতলব ছেড়ে দে, কনক! এতদিন যা হয়েছে হয়েছে, এখন, আমার কাছে থেকে, সামান্য 'সিক্‌নার্সে'র' কাজে বাহাল করে দিয়ে যে মেয়েটার আখের নষ্ট করবি, সে আমি কিছুতেই হ'তে দেব না। ও এখন বছরখানেক আমার ইস্কুলে পড়ে অন্ততঃ একটা পাশ করুক, তার পর চেষ্টা-চরিত্র করে ওকে ডাক্তারী পড়াতে হবে। তড়ির যে রকম জ্ঞান-বুদ্ধি—ও নিশ্চয় লেডী-ডাক্তার হয়ে বেরুতে পারবে। তখন আমারও মুখ উজ্জ্বল হবে, আর তোরও সকল দুঃখ-কষ্ট ঘুচে যাবে।...কি বলিস্?"

কমলবাসিনীর কথায় কনকমালা হঠাৎ জবাব করিতে পারিলেন না। তাঁহার স্বামী যখন জীবিত ছিলেন, তখনও মেয়ের সম্বন্ধে এতদূর উচ্চাশা দু'জনের কেহই মনে স্থান দিতে পারেন নাই। ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া, শেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আমার কি সেই বরাত ভাই—বড় হতভাগিনী যে আমি! তড়িতা লেডী-ডাক্তার হবে আর আমার মত কাঙ্গালী তাই চোখে দেখ্‌বে! ওঃ, এত বড় সুখের আশা— এ যে স্বপ্নেও ভাবা যায় না—"বলিতে বলিতে উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারা কষ্টে সম্বরণ করিয়া শেষে কহিলেন—"কিন্তু এত খরচা আমি যোগাবো কোত্থেকে?"

কমলবাসিনী কহিলেন—"কেন খরচের অভাব হবে কিসে শুনি?" বাড়ীভাড়া, কি খাই-খরচ, এ সবে তো তোদের খরচা নেই, আমারও তা গায়ে লাগে না। খরচ যা কিছু কেবল মা-মেয়ে দুজনকার কাপড়-চোপ্‌ড়ের। তা, তুই তো ইস্কুল থেকে মাইনে পাচ্ছিস—তিরিশ টাকা করে, ..., একটুও ভাবতে হবে না ভাই! আমি ঠিক্ বল্‌ছি—যেমন করে হোক্

ঐ থেকেই তড়িতার পড়ার খরচ কুলিয়ে যাবে। কোন একটা ভাল কাজ করতে গেলেই গোড়ায় চিন্তা আসে—পাছে সফল না হওয়া যায়!......কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করিস ভাই! তড়িতা নিশ্চয়ই ডাক্তার হবে!”

কনকমালা আর জবাব করিতে পারিলেন না, নীরবে আশ্রয়দাত্রী বাল্য-সঙ্গিনীর মুখের পানে চাহিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতার অনাবিল অশ্রু-ধারায় তাঁর গণ্ড ভাসিয়া গেল।

সংসারে যে ব্যাপারটায় মানুষের গৌরব করিবার থা... তাহা লইয়া দিন-রাত ঢেঁড়া পিটিয়া বেড়াইলেও যেন মনের সাধ মিটিতে ... না। ভাগ্যবলে কমলবাসিনী যে অশেষ গুণবান্ পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার গৌরবের সীমা পরিসীমা ছিল না, যখন-তখন যার-তার কাছেই তিনি নলিনের কথা পাড়িয়া অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিতেন। স্থানীয় বিশিষ্ট পরিচিত এবং অল্পপরিচিত প্রত্যেকের কাছেই ব্যাপারটা অতিশয় পুরাতন হইয়া যাওয়ায়, ইদানী কমলবাসিনী পুত্রের প্রশংসা করিবার যে প্রচণ্ড উৎসাহ, তাহা কতকটুকু হারাইতে বসিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ অতর্কিতে নবাগতা কনক ও তড়িতাকে পাইয়া তাঁর উৎসাহের মন্দীভূত বেগ খরতর হইয়া উঠিল, এক মুখে হাজার মুখের শক্তি লইয়াই যেন পুত্র-গৌরবে গর্ব্বিতা জননী এই মা ও মেয়ের কাছে নলিনের ক্ষুদ্র গুণকেও বিশাল করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন।

তাহাতে কনকমালার বিশেষ কিছু না হইলেও, সংসার-জ্ঞান-হী... —সরলা কিশোরীর হৃদয়ে এমন একটা ছবি, পাথরের খোদার মত, কাটিয়া বসিয়া গেল যে, ভবিষ্যতে সে দাগ আর মুছিবার সম্ভাবনা রহিল না।

সেদিন বিকালবেলা সংসারের কাজকর্ম্ম সারিয়া, তড়িতা নলিনের ঘরে বসিয়া—দেওয়ালে সংলগ্ন তাহার ফটোগ্রাফের দিকে বারংবার চাহিতে চাহিতে—তাহারই জন্য, একজোড়া মখ্মলের জুতার উপরে রেশমের ফুল

তুলিতেছিল ; হঠাৎ একখানা খোলা চিঠি হাতে করিয়া, কমলবাসিনী হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—"এই দেখ্ মা, আজ আবার নলিনের চিঠি এসেছে। ছুটীতে বাড়ী আসতে পারেনি বলে, বাছা আমার কত দুঃখ জানিয়েছে।···এমন ছেলে কি আর কারুর হয়!"

কমলবাসিনী, তড়িতার হাতে চিঠিখানা পড়িতে দিয়া, তাঁর স্বাভাবিক অভ্যাসটুকু ছাড়িতে পারিলেন না, নিজের মনে নলিনের নানা গুণগ্রামের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু চিঠিটা হাতে লইয়াই হঠাৎ কেমন যেন একটা লজ্জার ভাবে তড়িতা জড়সড় হইয়া পড়িল, তাহার মাথাটি আপনা হইতেই নত হইয়া গেল। মাসীমার বিস্তর অনুরোধ সত্ত্বেও কিছুতেই আর চিঠি পড়িতে পারিল না।

কমলবাসিনী হঠাৎ তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—"লজ্জা কি মা—পড় না, নলিনের চিঠি পড়বে,—তাতে লজ্জা কিসের? পড়ে দেখে তুমিই বল—এমন ছেলে পাওয়া কত বড় ভাগ্যের কথা!"

আবার তড়িতার বুকের ভিতরটা দুরু-দুরু করিয়া উঠিল! কম্পিত হস্তে চিঠিখানা চোখের সামনে আড়াল করিয়া ধরিয়া মনে মনে পড়িতে লাগিল। কমলবাসিনী হঠাৎ হাসিয়া কহিলেন—"পাগ্লী মেয়ে কোথাকার! ······যেন মার পেট থেকেই ঝুড়িখানেক লজ্জা বেঁধে এনেছে!······বলি মনে মনে পড়ছিস কেন? চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে আমাকে শোনা?······ হিঁদুদের ঘরের ক'নে বউটির মত করে বরের চিঠি পড়তে গেলে কি আমাদের সভ্য সমাজে চলে?"

বলিয়া ঠোঁট টিপিয়া একটু আড়ে হাসিলেন, কিন্তু বিপদে পড়িল তড়িতা!—একান্ত চেষ্টায় কোন রকমে নিজের অবাধ্য বুকখানাকে সাম্লাইয়া লইয়া,—আম্তা-আম্তা করিয়া—পড়িতে লাগিল। কিন্তু কমলবাসিনী, তাহার পড়িবার ভঙ্গি দেখিয়া, খুব একচোট হাসিয়া,

বলিলেন—"মর পোড়ারমুখি, তুই যে কনে-বউদের বেহদ্দ হলি,...নলিনের সঙ্গে মিলবে বটে !"

বলিতে বলিতে, আদর করিয়া তড়িতার চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিলেন। তড়িতার চিঠি পড়া আর শেষ হইল না, অত্যধিক সরমে তাহার নীচু মাথাটা অতিশয় নমিত হইয়া পড়িল। এবং সামান্যক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, ঘর হইতে চলিয়া গেল। তাহার বাধ বাধ গতি-ভঙ্গি দেখিয়া কমলবাসিনী ক্রমেই মোহিত হইয়া পড়িতেছিলেন;......বাস্তবিক রমণীর লজ্জা, এমনি পবিত্র, এমনি সুন্দর, এমনি অপার্থিব বস্তু যে, পলায়িতা কিশোরীর পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে সহসা তাঁহার মনে হইল যে. বিদ্যুতের মত চঞ্চলা রূপসী বিজলীলতাও বুঝি এই আশ্রিতা কিশোরীর পাশে দাঁড়াইবার যোগ্য নহে !

কিন্তু এই নানা সুখ দুঃখ চিন্তা তৃপ্তির মধ্য দিয়া যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই কনকের চোখের উপরে যেন এক অপরূপ নূতন ছবি অস্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া উঠিল। তিনি নবরাগরঞ্জিতা স্নেহময়ী কন্যার মন বুঝিবার জন্য সর্ব্বদা তাহার হাবভাবের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে ছাড়িলেন না।

সহসা একদিন বিকাল বেলায় অনাদিনাথের এক টেলিগ্রামে পতির পীড়ার সংবাদ পাইয়া, কমলবাসিনী ব্যস্তভাবে কনকমালাকে সেই খবর শুনাইয়া, শেষে কহিলেন—

"ভাই, এখন বুঝেছি যে, তুমি ঈশ্বর-প্রেরিত হয়েই এখানে এসেছ, নইলে আজকের এই সর্ব্বনেশে বিপদে যে কি হতো, তা ভাবতে গেলে সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠে ! দেখতেই তো পাচ্ছ আমার ঝঞ্ঝাট কত—আমার স্কুলের একজামিন কাছে এসেছে, এখন বাড়ী ছেড়ে এক পাও নড়বার জো নেই। অথচ তাঁর এমন ব্যামোর খবর পেয়ে, না গিয়েও থাকতে পারছিনি।...আজ আর ট্রেন নেই, কাল সকালের গাড়ীতেই আমি

কলকাতায় যাব। তোমায় আর বেশী কথা কি বলবো ভাই! তুমি আমার বোনের বাড়া. তোমার হাতেই সংসারের সব ভার ছেড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে রয়েছি। তা ছাড়া তড়ির সেবা-যত্নে—আমার যে মেয়ে নেই, একথা একবারও মনে হয় না। এখন—"

কনকমালার চক্ষু পূরিয়া জল আসিয়াছিল. ধরা গলায় কহিলেন—'অমন কথা বলে লজ্জা দিয়োনা দিদি! তোমার যা হুকুম আছে বলো। তোমার ঘরকে তো আমি একদিনও পরের ঘরকন্না ভাবিনি যে—"

—"তা জানি ভাই, ছেলেবেলায় নিজের মুখের খাবার অর্দ্ধেক আমার মুখেগুঁজে না দিয়ে খেতে না—সেই কনক আমার তুমি! শোন, আমি তো কালই চল্লুম, অসুখ তাঁর যে রকম বেড়েছে, তাতে, কবে যে ফিরতে পারবো জানি না।...এখন স্কুলের অবস্থা দিন-দিন উন্নত হচ্ছে, কত কষ্টে যে এটাকে দাঁড় করিয়েছি তা আমি জানি আর জানেন স্বয়ং ঈশ্বর!... এ বছর যে তিনটি মেয়ে পরীক্ষা দেবে, তার দুটিও যদি পাশ করতে পারে, তা'হলেও সকল দিক রক্ষা হয়। আমি নিজে এ সময় থাকৃতে পারছিনি। আজ থেকে আমার এত আদর আর শ্রদ্ধার ইস্কুলটি তোমার হাতে দিয়ে চল্লুম। আমি জানি, এ ভার নেবার মত ক্ষমতা এক তোমা ছাড়া এখানকার আর কারো নেই। তাই তোমার ওপরে ভার দিয়েই নিশ্চিন্ত হলুম। সংসারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে যেমন আমায় অনেবড় ঝক্কি থেকে বাঁচিয়েছ, তেমনি এ বোঝাটাও আমার নাও,... আজ অতি বড় বিষাদের দিনে. আমাকে দুর্ভাবনার হাত থেকে রক্ষা কর।"

বলিতে বলিতে দুইটা বড় বড় চাবির গোছা কনকের হাতে দিলেন। কনক ঈষৎ ক্ষুব্ধভাবে চক্ষু মুছিতে মুছিতে কহিলেন—"যে ভার তুমি দিয়ে যাচ্ছ দিদি, আমার প্রাণ যাবে, তবু তাতে একটুও গাফিলি হবে না।

কিন্তু আমার ও যেতে ইচ্ছা ছিল ভাই !—তোমার সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে আমিও ভবতারণ বাবুর সেবা—"

—"পাগল আর কি ! তুই কলকাতায় তাঁর সেবা করতে গেলে আমার যে উপকার হবে, এখানে থাকলে যে তার চেয়ে ঢের বেশী উপকার হবে রে—ইস্কুলটা দেখাশুনা করবার লোক, তুই ছাড়া আর কে আছে তা বল্ ? এই যে—নলিন যদি খবর পেয়ে না থাকে তো, তাকেও আমি খবর দিতে দেব না। তার একজামিন কাছে এসেছে, এখন যদি খবর শুনে সে জোর করে চলে আসে, তো তার ভয়ানক ক্ষতি হবে। অনাদি-বাবু চিকিৎসার এতটুকু ত্রুটি করবেন না, তাছাড়া তাঁর মেয়ে রয়েছে—আমি যাচ্ছি—সেবার অভাব হবে না।"

কথাগুলা কনকের কাছে যেন কেমন-কেমন ঠেকিল, তিনি আর কিছু বলিলেন না। কমলবাসিনীও, নিশ্চিন্ত হইয়া, কার্য্যান্তরে বাহির হইয়া গেলেন। কনক চিন্তিত ভাবে মেয়ের কাছে গিয়া কহিলেন—"দিদি তো কলকাতায় চল্লেন, সেখান থেকে কর্ত্তার ব্যামোর খবর এসেছে। তা' তুই ক'টা দিন এখানে থাক্ না, আমি একবার দিদির সঙ্গে গিয়ে তাঁকে দেখে আঁসি ?"

তড়িতা নিবিষ্ট মনে জুতায় ফুল তুলিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই দৃঢ়-ভাবে অসম্মতি জানাইয়া নিজের কাজই করিতে লাগিল।

কনক, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে, মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন—"কেন, তাতে তোর আপত্তি কি ?"

হাতের কাজ বন্ধ না করিয়াই তড়িতা দৃঢ়স্বরে কহিল—"মাসীমার সঙ্গে আমি যাব কলকাতায়, তুমি এখানে থাক।" তারপর অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ছুঁচে রেশম পরাইতে লাগিল। কনক ঠিক এমনি জবাবই প্রত্যাশা করিতেছিলেন, ঠোঁটের আড়ে ঈষৎ হাসি চাপিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন—"কেন বল্ দেখি, তুই সেখানে গিয়ে করবি কি ? আমি গেলে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা হবে, তুই তো তেমন পারবি নি, তোর গিয়ে লাভ কি ?"

তড়িতা জবাব করিল না—নিবিষ্ট মনে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

কনক আবার বলিলেন—"তা হলে, এই কথাই রইলো, আমি দিদিকে বলিগে—কেমন ?"

এবার মাথা তুলিয়া তড়িতা জবাব দিল—"বল্‌ছি আমি যাব—"

—"কেন, তুই গিয়ে করবি কি ?"

—"খুসী—আমি যাব।...কাজের সময় কেন অন্যমনস্ক করে দিচ্ছ মা ?"

—"কি তোর এমন কাজ নষ্ট হচ্ছে ? আজ ক'দিন ধরে যে ওই জুতো জোড়া নিয়ে পড়েছিস—দু'দিন রয়ে-বসে করলেও তো হতো ?"

এবার তড়িতা থপ্ করিয়া বলিয়া ফেলিল—"মাসীমা যাবার আগেই এটা শেষ করে দেওয়া চাই।"

কনক খানিকক্ষণ চুপ করিয়া মেয়ের দিকে চহিয়া, শেষে যেন আপনা-আপনি বলিয়া উঠিলেন—"সব কাজেই তাড়াতাড়ি ! নলিনের এখন এক্‌জামিনের সময়, সে যদি কলকাতায় না-ই আসতে পারে ? দু'দিন রয়ে-বসে করলে জিনিসটাও ভাল হ'তো,...এরপর যখন বাড়ী আসবে—তখনই নয় দিবি !"

বলিতে বলিতে স্বকার্য্যে চলিয়া গেলেন। তখন হঠাৎ যেন তড়িতার চমক ভাঙিল। মা যে সহসা আসিয়া কেন ওরকম কথা বলিয়া গেলেন, তাহা সে ভাবিয়াই পাইল না, কেবল বিমর্ষ ভাবে মাতার গমনপথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।...তাই তো—"সে যদি কলকাতায় না-ই আসতে পারে !"

হঠাৎ তাহার সমস্ত উৎসাহ যেন নিবিয়া গেল ! একশোবার করিয়া কেবলই ওই এক কথা মনে হইতে লাগিল—"যদি না-ই আসতে পারে !"

তড়িতা, হাতের কাজ আর সম্পন্ন করিতে পারিল না, সেগুলাকে তুলিয়া রাখিয়া বরাবর রান্নাঘরে আসিয়া মাতার অলক্ষ্যে একখানি বঁটী টানিয়া আনাজ কুটিতে বসিল।

কনক কন্যার আগমন টের পাইয়াও, পিছন ফিরিয়া নিজের কার্যে নিবিষ্ট রহিলেন। তড়িতা অস্থির হইয়া উঠিল; মাতার মনোযোগ আকর্ষণের অভিপ্রায়ে একটুখানি উস্‌খুস্ করিয়া, শেষে—আপনা-আপনি—রুক্ষভাবে বলিয়া উঠিল—"আমি পারি না বাপু,...কোন্ তরকারি কতগুলো কুটতে হবে বলে না দিলে, আমি কিন্তু ঝোড়া শুদ্ধ সব শেষ করে দেব।"

কনকমালা মৃদু হাসিয়া ঈষৎ পরিহাসের স্বরে কহিলেন—"তা' হলে, খুব কাজের লোক প্রমাণ হবে, আর দিদিও আদর করে তোকে কলকাতায় নিয়ে যাবেন।"

তড়িতা কৃত্রিম গম্ভীর্য্য বজায় রাখিতে গিয়া কাঁদ কাঁদ ভাবে কহিল—"তোমার সব তাতেই ঠাট্টা।...আমি কাজের লোক তো নই-ই!...সব সময় আমার বুঝি মন ভাল থাকে?...ভারি খালি খালি ধাপ্পা দিয়ে তুমি আমার জুতো বোনাটা শেষ করতে দিলে না।"

কনকমালা স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—"কে তোকে তোর কাজ ফেলে এখানে মোড়লী করতে ডেকেছে? আনাজ কোটবার সময় তো এখনো বয়ে যায়নি, যা-না—তুই তোর কাজে।"

তড়িতা কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ কমলবাসিনীকে দেখিয়া থামিয়া গেল। কমল, একেবারে রান্নাঘরে আসিয়া কনককে কহিলেন—"সব ঠিকঠাক করে এলুম কনক! সকলেই তোর হুকুম মাফিক চলবে। আর আমারও বোধ করি বেশী দেরী হবে না, একটু ভাল দেখলেই আমি তাঁকে নিয়ে চলে আসবো।"

এতক্ষণ তড়িতা সকল কথাই চুপ করিয়া শুনিতেছিল। যখন দেখিল মায়েরও যাওয়া ঘটিল না, তখন তার গোপন মনে অনেকখানি আশা জাগিল, দ্বিধা এবং কুণ্ঠার সহিত বলিয়া উঠিল—"মাসিমা, আমি যাবো—তোমার সঙ্গে! সেখানে গিয়ে, আমি মেসো-মশায়ের বিছানা ছেড়ে একবারও উঠ'বো না।...খুব সেবা করবো।"

স্মিতমুখে কমলবাসিনী কহিলেন—"দূর্ পাগলি! 'তা কি হয়? তোর মা এখানে একলা থাকবে কি করে?...ভাবনার কারণ নেই মা! ব্যস্ত হ'য়োনা। আমি নলিনকেও খবর দেব না; সবাই মিলে হট্টগোল করা আমি এতটুকু পছন্দ করি না।"

বলিয়া শেষে এমন ভাবের কথা কহিয়া তাহাকে নিরস্ত করিলেন যে, তড়িতা দারুণ সঙ্কোচে দ্বিতীয়বার আর সে প্রস্তাব উথাপন করিতেও মুখ পাইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

"ক' দিনের ছুটী নিয়ে এসেছিস বাবা ?"

মাতার কণ্ঠস্বরে বেদনার আভাসটুকুও বুঝিতে না পারিয়া নলিন বিস্মিত হইয়া চাহিল। ভবতারণের পীড়ার সংবাদ তাহাকে এমন সময় দেওয়া হইয়াছিল যে, তখন চিকিৎসকেরা জবাব দিয়া গেছেন। কমলবাসিনীর মনের ভিতরে যাই হোক, বাহিরে তিনি ধৈর্য্য বজায় রাখিয়াছিলেন যথেষ্ট। কিন্তু পুত্রকে আসিতে দেখিয়া আর তা পারিলেন না, পীড়িতের কাছে যাইবার আগেই তাহাকে তাড়াতাড়ি কক্ষান্তরে টানিয়া লইয়া গিয়া গম্ভীর স্বরে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"বল্ না—ক'দিনের ছুটী নিয়ে এসেছিস ?"

—"মোটে চার দিনের, বেশী নিতে ভরসা করিনি,...তিন মাস বাদেই একজামিন।"

ম্লানভাবে জবাব করিয়া, নলিন, মুখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু প্রাণপণ দমনের চেষ্টা স্বত্ত্বেও, যে ফোঁটাকতক জল তাহার চক্ষু হইতে টপ্ টপ্ করিয়া ঝড়িয়া পড়িল, তাহা কমলের নজর এড়াইল না। তাড়াতাড়ি ছেলের হাত ধরিয়া, একখানা চেয়ারে বসাইয়া সুমিষ্ট স্বরে কহিলেন—"ছিঃ বাবা, পুরুষ মানুষ তুমি, বড় হয়েছ—বিদ্যা, জ্ঞান, বুদ্ধি হয়েছে, তোমার কি অধীরতা শোভা পায় ? স্ত্রীলোক হয়েও আমি—আজীবন যে ঝড়-ঝাপটা সয়ে—তোমাকে মানুষ করে তুলেছি, তা কেবল ধৈর্য্য,

সহিষ্ণুতা আর বিবেচনার বলে। তুমি যে আমারই ছেলে—তোমার কি অধীরতা সাজে?...কার্য্যের জগতে সহস্র সহস্র বাধা-বিঘ্ন সর্ব্বদাই মানুষের পথ আগ্‌লে দাঁড়ায়। শোক, দুঃখ, অধীরতা এসব অসার! মানুষের যেখানে কোমলতা সেখানেই পরাজয়! দেহ থাকলেই অসুখ হয়, আর সংসারী যারা, তাদের ঝড়-ঝাপ্টাও সইতে হয়—"

সহসা বিজলীলতা ঘরে ঢুকিয়া কমলবাসিনীকে কহিল—"আপনি একবার শীগ্‌গীর ও ঘরে যান। সেই ডায়েট্‌টা দেওয়ার সময় হয়েছে।... আমি ততক্ষণ নলিনবাবুকে হাতমুখ ধোবার জল দিচ্ছি।"

কমলবাসিনী ছাড়া রোগীকে অন্য কেহ ঔষধ পথ্য গুলি ঠিক সময় মত এবং সুবিধা মত দিতে পারিত না। বিজলীর কথায় তিনি আর দাঁড়াইলেন না। যাইবার সময় পুত্রকে বলিয়া গেলেন—"ব্যস্ত হ'স্‌নে নলিন! ঘণ্টা খানেক আগে উনি তোর খোঁজ করেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ এ অবস্থায় তোর সঙ্গে দেখা হ'লে কোন ক্ষতি হ'বে কি না সেটা না জেনে, ওখানে তোর যাওয়া উচিত হবে না। আমি ডাক্তারবাবুর কাছে লোক পাঠিয়েছি, ফিরলো বলে।"... তারপর অন্তরের দাবিয়া রাখা দুঃখটুকু যথেষ্ট শক্তিতে আরও দাবিয়া রাখিলেন।...নলিন ও বিজলীলতা উভয়েই এই অসীম ধৈর্য্যশালিনীর আন্তরিক দৃঢ়তা দেখিয়া মনে মনে চমৎকৃত এবং ভয়ানক বিস্মিত হইয়া গেল।

মাতার প্রস্থানের পরও, নলিন আগের মত বিজলীর সহিত কথা কহিল না। একটা চাপা বেদনা তার গুপ্ত অন্তরের মধ্যে কেবলই ঠেলিয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছিল। বিজলী তাহা বুঝিয়াই সান্ত্বনার ছলে কহিল—"ডাক্তারবাবু কালকেও আশা দিয়ে গেছেন—ভয় নেই!"

নলিন নীরবে এই কিশোরী সান্ত্বনা-দাত্রীর শুভ্র চঞ্চল মুখপানে চাহিয়া রহিল।

২১।১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

কিন্তু বিজলী তাহার স্বাভাবিক চাঞ্চল্যটুকু চাপিয়া রাখিয়াও রাখিতে পারিল না ; সহসা বলিয়া উঠিল—"আজ আচার্য্যের কাছে একটা নতুন গান শিখেছি, শুন্‌বেন ? খুব নতুন সুর,—আর ভারী উঁচু ধরণের ভাব !"

নলিনের বিস্ময়ের উপর সহসা এক পর্দ্দা বিরক্তির আচ্ছাদন পড়িয়া গেল।...ছি ছি মানুষ এত স্বার্থপর ও হইতে পারে !...আকুল অন্তরের সহস্র উৎকণ্ঠা লইয়া সে যে মুমূর্ষু পিতাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে, সে কথা কি এই বাপের আদরের ছুলালী কিশোরীটির একবারও মনে করা উচিত ছিল না !...অথচ একটু আগে সেই-ই মাতাকে বলিয়াছিল—"আমি নলিনবাবুর হাতমুখ ধোবার জল দিচ্ছি !"

...পিতৃবিরহকাতর পুত্রের হাজার উদ্বেগ ও ব্যাকুলতাকে উপেক্ষা করিয়া, যে নারী অসময়ে গান শুনাইবার কল্পনা করিতে পারে, সে কি *নারী হউক না অল্পবয়স্কা কিশোরী ;—কিন্তু অজ্ঞান তো নহে !......ছি ছি ! নলিনের ভিতরটায় কে যেন বিষাক্ত জ্বালার উৎস খুলিয়া দিয়া গেল।*

মুখখানা দারুণ ঘৃণায় কালো করিয়া তিক্তস্বরে বলিয়া উঠিল—"উঃ এত হৃদয় হীন !...এতটুকু বোধশক্তি থাক্‌তে নেই তোমার !"

বিজলী হঠাৎ এতখানি তিরস্কার বরদাস্ত করিয়া রহিল না। প্রিয় ব্যক্তির ক্ষুদ্র উপেক্ষা বা তিরস্কার যতখানি বুকে বাজে, ততখানি বুঝি অন্যের সহস্র ভর্ৎসনাতেও হয় না !...অভিমান ও ক্রোধের একত্র সমাবেশে তার মুখ-চোখ এক অস্বাভাবিক রাগে রাঙিয়া উঠিল। হঠাৎ সে [illegible] বসিল—"ভদ্রভাবে কথা ব'লবেন !...আমি আপনার চোখ রাঙানি সইতে রাজী নই !"

হঠাৎ নলিনের যেন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল ! নির্জীবের মত কিছুক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া, সেখানেই সে দাঁড়াইয়া রহিল।

আজ পদে পদে তাহার চোখের সম্মুখে যেন পৃথিবীটা ওলোট পালোট

হইয়া যাইতে বসিয়াছে! শীতের জমাট কুয়াসার মত নিবিড় অন্ধকার রাশি স্তরের পর স্তর সাজাইয়া আকাশের নির্ম্মল শান্ত আলোকটুকু অবধি ঢাকিয়া দিয়া, যেন জগতের অস্তিত্বটাই লোপ করিতে চাহিতেছে!...উঃ—বিজলীলতার কণ্ঠে এহেন নির্ম্মম কঠোরতা!...নলিন এ বিপদে আর কত সহিবে!

সহসা কক্ষান্তর হইতে, অতি ক্ষীণ আর্ত্তকণ্ঠের একটুখানি ভগ্নস্বর—যেন তাহারই নাম লইয়া—খোলা জানালার পথে বাহির হইয়া, 'হায় হায়' করিতে করিতে বাতাসে ভাসিয়া গেল! মুহূর্ত্তে নলিনের হৃদয়-তন্ত্রীগুলি, প্রবল বেগে, ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল! বিদ্যুতের মত একটা প্রচণ্ড শক্তি তাহার দেহ-মনকে সবেগে নাড়াইয়া খাড়া করিয়া দিল! সে আর কোন কিছুতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, দুই হাত দিয়া সবলে দোর ঠেলিতে ঠেলিতে, উন্মাদের মত ছুটিয়া চলিল।......

...যে কক্ষে মৃত্যুপথযাত্রী ভবতারণ শুইয়া ছিলেন—সে ঘরটা বাড়ীর সবশেষে, দোতলার খোলা বারান্দার লাগালাগি! ঠিক তার নীচেই অন্তঃপুরের ফুল-বাগান। বিজলীলতা সেইখানে দাঁড়াইয়া প্রস্ফুটিত গোলাপের দিকে চাহিতে চাহিতে—ক্রোধে—ক্ষোভে—ব্যর্থতার দুঃসহ অপমানে কাঁদিয়া ফেলিল।

ওদিকে নলিন অস্থির পদে টলিতে টলিতে—ভবতারণের ঘরে ঢুকিয়া আকুল কণ্ঠে ডাকিল—"বাবা—বাবা—"

অন্তিম শয্যায় শুইয়া ভবতারণ, দুই হাতের ভিতরে বন্ধু অনাদিনাথের একখানা হাত লইয়া, তাঁহার মুখের পানে নীরব ম্লান দৃষ্টিতে চাহিতে-ছিলেন। শিয়রে বসিয়া পত্নী কমলবাসিনী প্রিয়তম পতির আসন্ন চির বিচ্ছেদ কল্পনা করিয়াও, দারুণ শোককে যথাসাধ্য চাপিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন। মাঝে মাঝে পতির কোটরপ্রবিষ্ট নয়ন হইতে বিন্দু বিন্দু

নিঃসৃত জলধারা মুছাইয়া দিতেছিলেন। কিন্তু অনাদিনাথের হৃদয়ের ভিতরে তখন প্রলয়ের তুফান ছুটিতেছিল! নলিনকে সহসা শোকার্ত্ত দেখিয়া তিনি বন্ধু শোক চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না—অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"নলিন! নলিন! সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে!...যমের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করেও বাঁচাতে পারলুমনা।"

কমলবাসিনী অসীম সহিষ্ণুতার সঙ্গে নলিনের ডান হাত ধরিয়া গম্ভীর অচঞ্চল স্বরে কহিলেন—"নলিন! ধৈর্য্য হারিয়োনা, স্থির হয়ে থাক—বিরক্ত করবার, গোল করবার সময় এ নয়। যে শান্তিনিকেতনের পথে উনি যাত্রা করে চলেছেন, ক্ষুদ্র আবেগের উচ্ছ্বাসে, সে কাম্য পথে বাধা দিবার প্রয়াস করো না, ঐকান্তিক চিত্তে প্রার্থনা কর—ওঁর সে পথ পুষ্পাস্তরিত হোক্।"

কথাগুলো নলিন ঠিক বুঝিতে পারিল কি না, বোঝা গেল না। সে গভীর বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে মায়ের মুখপানে চাহিল।

তারপরে, সহসা যেন কি এক তীব্র ব্যথায় মুখ ফিরাইয়া লইয়া, পিতার শয্যা-সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিল এবং বাপের অসাড় হাত দু'খানি নিজের দুই হাতের ভিতরে লইয়া মুখ লুকাইল।

নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত, ভবতারণের শুষ্ক, পাণ্ডুর মুখখানি চকিতে একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, পুত্রের নত মস্তকের উপরে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া সেই সজল চাহনি বন্ধুর পানে ফিরাইলেন। অনাদিনাথ তাড়াতাড়ি এক হাতে নলিনের এবং অন্য হাতে বন্ধুর হাত ধরিয়া বাষ্পসজল কণ্ঠে কহিলেন—"নিশ্চিন্ত হও ভাই, তোমার নলিন আজ থেকে আমার হল।"

পরম নিশ্চিন্ততায় ভবতারণের রোগমলিন চক্ষু দুটি ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল। নলিন সেই নিস্পন্দ দেহের পা তলার দিকে পড়িয়া শোকার্ত্ত কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল—"বাবা!—বাবা!"

তখন নীচের জনহীন উদ্যান-বাটীকা হইতে বিজলীলতার বেদনা-কাতর কণ্ঠের হতাশ-সুর ভাসিয়া আসিতেছিল—

"দুদিনের খেলা দুদিনে ফুরায়—
দীপ নিভে যায় আঁধারে।"

২১।১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

নবম পরিচ্ছেদ

—"কই তড়ি, ডাকের সময় চলে গেল, আজও খবর এলোনা তো? যে রকম দুর্ভাগিনী আমরা, তাতে বরাতে যে এই সুখটুকু টিকবে—এমন ভরসা হয় না। এই যে ক'দিন ধরে একখানও চিঠি আসছে না,—কে জানে কি ঘটেছে সেখানে?".

তারপর নীরবে কনকমালা একটা লম্বা নিশ্বাস টানিয়া অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

তড়িতা মাতার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া বলিল—"সেখান থেকে চিঠি না আসুক, আমাদের এখান থেকে যাওয়া উচিত ছিল না!...তাদের লিখবার ফুরসৎ হয়তো পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের—" বলিয়াই থামিয়া গেল।

কনকমালা বলিলেন—"তুইও তো লিখে রোজ খবর নিতে পারিস!"

তড়িতা নতমুখে রহিল। তাহার অন্তরের সহস্র ব্যাকুলতা [illegible] প্রকারে বাহিরে আসার পথ খুঁজিতে চাহিলেও, মাতার নিকট [illegible] করিয়া কিছু বলিতে পারিল না।

গত কয়দিন হইতেই চিঠি লিখিয়া সংবাদ জানিবার জন্য মনে মনে বিপুল আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও, মাতার নিকটে দারুণ লজ্জার বশে কোন কথাই প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিলনা। অথচ শিক্ষিতা হইয়াও এই তুচ্ছ লজ্জা যে কেন,—তাহাও সে ভাবিয়া ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না!

...কনকমালারও যে খবর লইবার আগ্রহ ছিল না, এমন নহে। কিন্তু কমলবাসিনী যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিলেন—অনর্থক চিন্তা করিয়া ফল হয় না। শোক-দুঃখ-পীড়া-মৃত্যু এই লইয়াই মানুষের জীবন এবং সংসার! সুতরাং একমাত্র স্কুলের খবর দেওয়া ব্যতীত আর কোন কথাও যেন কনক জানিতে না চাহেন। যাহা জানাইবার প্রয়োজন হইবে, তাহা তিনিই জানাইয়া দিবেন।

এইসব কারণের জন্যই ভবতারণবাবুর কঠিন অবস্থার সকল সংবাদ ঠিক সময়ে তড়িতা বা তাহার মা কাহারও গোচরে আসে নাই। কিন্তু মনের শান্তি যখন সত্য সত্যই লোপ পাইল, তখন কনকমালা বেশ ভাল-রূপ সংবাদ জানিতে চিঠি লিখিবার সংকল্প করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ দুসঃহ শোকের সংবাদ আসিয়া তাঁহাদের অশান্তির সীমাকে অসীম করিয়া দিল।...মা মেয়ে কাহারও শোকের অবধি রহিল না।

নানা চিন্তায় সেদিন রাত্রিতে তড়িতার কিছুতেই নিদ্রা আসিতেছিল না। কনক মেয়ের অসহ্য জ্বালা খুব ভাল করিয়াই বুঝিতেছিলেন! কিন্তু হা রে গরীবের দুরাশা! এ যে চ্যাটাই শুইয়া লক্ষ টাকার স্বপন দেখা! নতুবা যে নলিনের জন্য আজ তড়িতার এত আকুলি বিকুলি, সে কি তাহার ন্যায় হতভাগিনীর অদৃষ্টে সত্য সত্যই একদিন সকল সাধনা সফল করিয়া —তাহারই পিপাসার্ত্ত বুকে সন্তান-স্নেহ জাগাইয়া দিতে আসিবে! হা-রে কল্পনা!...কনকমালা, দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—

"দেখ্ তড়ি, তোকে আবার সাবধান করে দিচ্ছি মা, অনিশ্চিত দুরাশাকে মনে মনে পুষে, দুঃখের উপর যাতনা ডেকে আনিস্‌নি নি। বড় অভাগিনী আমরা মা, কমলের সত্য দুর্ভাগ্যের বাতাস আমাদের এই আশ্রয়স্থলটুকুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে ভূমিসাৎ না করে দেয়, ঈশ্বরের কাছে এখন সেই প্রার্থনা কর।"

২১৷১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

ভবতারণের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া অবধি এই ভয়টাই হইয়াছিল কনকের সব চেয়ে বেশী। তার উপর মেয়ের মনের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া, ভাবনার সাগরে ভাসিয়া, তিনি যখন তড়িতাকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়া দিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, তেমনি দিনে কমলবাসিনী ফিরিয়া আসিয়া, সদয় ব্যবহারে তাঁহার প্রথম চিন্তাটা দূর করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু দ্বিতীয় চিন্তাটা তখন আরো প্রবল হইয়া জাঁকিয়া বসিল।—সে চিন্তা তড়িতার অন্তর্জাত নব ভাবের!

তড়িতার মনের কথা—টের না পাইলেও, কমলবাসিনী যে কতকটা বুঝিতে না পারিয়াছিলেন এমন নয়। অথচ সে সম্বন্ধে কনকের নিকট কোন দিন কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করা দূরে থাকুক, বরং ইচ্ছা করিয়াই যেন ঠেলিয়া রাখিতেছিলেন! তবুও, বচনে-ব্যবহারে, আকারে ইঙ্গিতে তড়িতাকে সর্ব্বদা প্রশ্রয় প্রদান ভিন্ন কমলবাসিনী কেন যে দমন করিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহাই ভাবিয়া কনক অধীর হইয়া উঠিলেন। অথচ এবার কলিকাতা হইতে ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে, কমলবাসিনীর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য এত অধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল যে, কমল নিজ হইতে কথাটা না পাড়িলে, আশ্রিতা কনকের পক্ষে তাহা উত্থাপন করিবার সাহস ও শক্তি রহিল না।

...দিনকতক পরে তড়িতা যখন, তাহার স্থগিত রাখা জুতা-জোড়াটায় ফুল তুলিতেছিল, সেই সময় কমলবাসিনী তাহার সামনে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। এই অবসরে কনক ধীরে ধীরে আসিয়া আশ্রয়দাত্রীর পিছনে দাঁড়াইলেন। মাতাকে আসিতে দেখিয়াই, তড়িতা বলিয়া উঠিল —“দেখ তো মাসিমা, এই যে মাঝখানটাতে গোল করে লতার বেড়া দিয়ে তার ভিতরটা ফাক রেখিছি, মা খালি বলেন যে, ওখানে একটা ফুটন্ত গোলাপ করে দে।...বল দেখি তা কি ভাল হবে?”

কনক তাড়াতাড়ি বলিলেন—"কেন হবে না, অমনিতর খালি থাকলে কি ভাল দেখায় ?"

—"খালিও যদি থাকে, তাহলেও একরাশ ফুল দিয়ে একঘেয়ে জবড়্জঙ্ করার চেয়ে ঢের ভাল।...আচ্ছা—তোমার কি পছন্দ হয় বল তো মাসি-মা ?...সত্যি বলা চাই !"

কমলবাসিনী মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"কেন রে আমি আবার মিছেও বলি নাকি ? আমাদের বুড়ো মানুষের পছন্দে কি হয় বল্ ! আজকালকার ছেলেদের পছন্দসই জিনিষ তৈরী করতে, কি তোদের মত আমরা পারবো-মা ? তাছারা নলিন ও রকম জবড়জঙ্গি ভালবাসে না।...কিন্তু ওখানটাতে তুই কিছু করবি, না অম্‌নি খালি রাখবি ?"

তড়িতার সারা মুখখানার উপর দিয়া যেন একটা তড়িতের লীলা বহিয়া গেল, মুখ না তুলিয়াই সলাজ-কণ্ঠে জবাব করিল—"ওখান—টায়—না—ম—লিখে দেব।"

—"বেশ, সেই ভাল হবে।" বলিয়া কমলবাসিনী উৎসাহ দিলেন, কিন্তু কনকমালা কহিলেন—"নলিনাক্ষ—এই অক্ষরগুলো এক লাইনে বড্ড ছোট ছোট হবে—ভাল দেখাবে না। এক লাইনে তিনটের বেশী হরফ ধরাতে গেলে পারবি না।"

—"নলিনাক্ষ—অত হাঙ্গাম,—কেন যুক্তাক্ষর লেখবার দরকার কি ?" বলিয়া, কমলবাসিনী অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিলেন—"এইখানে লেখ—নলিন, আর নীচে লেখ—তড়িতা। তোদের দুজনেরই নাম থাক, ওপরে নীচে করে লিখলে, ছ'টা অক্ষর বেশ ধরে যাবে।"

তড়িতার মুখখানা আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কোন কথা না বলিয়া, মুখ নীচু করিয়া বুনিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু কনক এ সুযোগ

ছাড়িলেন না, নলিনের কথা পাড়িবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁ দিদি, নলিনের একজামিনের আর একমাস বাকী, না?"

—"বোধ হচ্ছে তাই! কেমন তড়ি, তুই তো সে চিঠি পড়েছিলি?"

তড়িতা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। কমলবাসিনী একটা লম্বা নিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন—

—"কি যে হবে তাই বুঝতে পারছি না। সেই বিপদের সময়ে চারদিনের ছুটী নিয়ে এসে বাছার এক হপ্তার ওপর দেরী হয়ে গেছে, তার উপর এমন মন-মরা হয়ে চলে গেছে যে, আজ পর্য্যন্ত পড়াশুনোতে মন লাগাতে পেরেছে কি না, আমি খালি সেই কথাই ভাব্‌ছি।"

—"তা'হলে দিদি, তাকে সঙ্গে করে একবার এখানে নিয়ে এলে না কেন? হপ্তাখানেক বাড়ীতে এসে থেকে গেলে তার মন অনেকটা শুধরে যেতে পারতো?"

—"আ—আমার কপাল! সেখানে আমরা সবাই মিলে প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাকে বোঝাতে পারিনি। বাড়ীটা যেন তার বিষ হয়ে উঠেছিল, —দিনু রাত্তির গিয়ে পড়ে থাকতো সেই কোথায়—তাঁলতলায় নরেন বাবুর বাসাতে! এই প্রথম শোক—মনে ভয়ানক ঘা লেগেছে কি না! তা আর বাড়ীতে আনবার কথা পাড়বো কেমন করে বল? তবে নরেন বাবুও এখানে আনবার কথা বলেছিল বটে, কিন্তু অনাদিবাবু বল্লেন যে, বাড়ীতে আসার চেয়ে কলেজে ফিরে গেলে, সেখানে পড়াশুনো আর প্র্যাকটিকাল কাজ-কর্ম্মের চাপে পড়ে ওর মন শীগ্‌গির শুধরে যাবে।...সেই জন্য আর বাড়ী আসবার কথা বলিনি তাকে।"

—"কিন্তু এ রকম সময়ে কেউ আদর যত্ন করবার লোক কাছে থাকলে—"

—"সে জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই, অনাদিবাবু তার উপর নজর রেখে

বসে আছেন, হপ্তায় তিনবার করে লোক পাঠিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। তার-পরে এই মাসটা কাটলেই—যে দিন তার একজামিন শেষ হবে, সেই দিনেই তিনি নিজে গিয়ে তাকে তাঁর কাছে এনে রাখবেন।...সে সব দিকে একটুও ত্রুটি হবে না। আমি এখন কেবল এই ভাবছি যে, দারুণ শোকে অধীর হয়ে, সে নিজের কাজে না অবহেলা করে!"

—"তাতে কি তার দোষ দেওয়া যায় দিদি? একে ছেলেমানুষ—তার উপর পিতৃশোক!...আহা—"

—"এই কোমলতা সকল সময়ে খাটে না কনক, পিতৃশোক বলে, কাজ তার মুখ চেয়ে অপেক্ষা করবে না। সংসারে সকলকেই যখন নিজের নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হয়, তখন সকলেরই সে দিকে তীব্র লক্ষ্য রেখে চলাই দরকার।...শোক-দুঃখ বিপদ-আপদে অভিভূত হয়ে যে নিজের কাজ নষ্ট করে তার মত মূর্খ আর সংসারে নেই। শোক-দুঃখ, আমোদ-আহ্লাদ—ও সবই সমান, সবই ক্ষণিকের জিনিস, কিছুই স্থায়ী নয়। এই ক্ষণিকের মোহ ক্ষণিকেই কাটিয়ে ওঠা উচিত, নইলে তাতে মজে কাজ হারালে পরিণামে অশেষ কষ্ট পেতে হয়।"

সহসা, ফটকে ডাক-হরকরা হাঁকিল—"চিঠি নিয়ে যান।"

তড়িতা ব্যস্ত হইয়া, নীচে নামিয়া গেল। কমল ও কনক পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু পরক্ষণেই তড়িতা যখন কম্পিত করে এক খানা খামের চিঠি আনিয়া মাসীমার হাতে দিল, তখন উপরের শিরোনামা দেখিয়াই, কমলবাসিনী চঞ্চলভাবে বলিয়া উঠিলেন—"নলিনের চিঠি! এই পরশু একখানা এসেছে, আবার আজই কি খবর!"

কনক ও তড়িতা উভয়েই উৎসুক নেত্রে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। কমল ব্যস্তভাবে চিঠি খুলিয়া মনে মনে পড়িতে পড়িতে শেষে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"ওঃ—সর্ব্বরক্ষে!...আমার তো প্রাণ চমকে উঠেছিলো!"

—"কি খবর ভাই—সব ভাল তো ?"

—"হ্যাঁ—এই পড়ে ছাখ্।"

বলিয়া, চিঠিখানা তড়িতার হাতে দিয়া, কহিলেন—"ভাল করে চেঁচিয়ে পড়্‌তো মা! দেখি কনক কিছু বুঝতে পারে কি না।"

তড়িতা সসঙ্কোচে যথাসাধ্য স্পষ্ট করিয়া পড়িল—

"মা, এ অবস্থায় অনাদিবাবুর স্নেহের পীড়ন বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আগে, সপ্তাহে তিন দিন লোক পাঠাইতেন, এখন পাঠাইতেছেন—প্রায় প্রত্যহ। তুমি জান নরেন আমার কে, তার চেয়ে আপনার কেউ এ জগতে আমাদের নাই। তেমন যে নরেন সেও এরকম ঘনিষ্ঠতা দেখাইতে পারে না। তাতেই আমার মনে নানা সন্দেহের উদয় হয়। আবার শুনছি—একজামিনের পরেই আমাকে লইয়া যাইবার জন্য তিনি নিজে আসিবেন, পাছে আমি যাইতে আপত্তি করি, সেই ভয়ে। কিন্তু এ সব আমার অসহ্য, তার উপর শিয়রে পরীক্ষা—এখন তাঁদের সঙ্গে কথা কহিবারও আমার ফুরসত নাই।...তুমি তাঁকে চিঠি লিখিয়া মানা করিয়া দিও, আমি লজ্জায় কিছু বলিতে পারি না। একজামিনের শেষ দিনেই রাত্রের গাড়ীতে আমি জনকতক সহপাঠীর সঙ্গে রুড়কীতে একটা জরুরী কাজ শিখিতে যাইব, সুতরাং তিনি যেন আমাকে লইতে না আসেন এবং উপস্থিত নিয়ত এই রকম লোক পাঠাইয়া আমাকে বিব্রত না করেন। এরূপ মাখামাখির ব্যাপারে আমি অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছি! দুই দিন নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবারও কি অধিকার নাই আমার? বিশেষ করিয়া—এটা যে আমার একজামিনের সময়—এ কথা তোমরা স্মরণ রাখিয়ো।...তোমার কুশল সংবাদ লিখিয়ো, এবং বাড়ীর আর সকলের সংবাদ দিতে ভুল করিয়ো না। ইতি—

সেবক নলিন।

পুঃ—আমার খবর নরেনের কাছে যথারীতি পাইবে, সুতরাং বাহিরে গিয়া নিয়মিত খবর দিতে না পারিলে, চিন্তিত হইবে না বা দুঃখ করিবে না।"

চিঠি পড়িয়া তড়িতার মুখখানি ম্লান হইয়া গেল, কিন্তু কমলবাসিনী হাসিয়া বলিলেন—"দেখ্‌লি তো কনক, তুই তার জন্যে ভাবছিলি—এখন ত্যাখ্‌। কিন্তু একজামিন দিয়েই যে রুড়কীতে চলে যাবে লিখেছে, এ কথায় আমার সন্দেহ আছে!...এটা কিন্তু—ও বাছাধনের চালাকি!"

—"কেন? জরুরী কাজের জন্যে যাবে—"

—"দূর—দূর, লেখার ভঙ্গি দেখে বুঝলিনি? পাছে একজামিনে ফেল হয় সেই লজ্জায় পালিয়ে থাক্‌তে চাইছে। বাড়ী এলে এখান থেকেও তো অনাদিবাবু নিয়ে যেতে পারেন, সেই ভয়ে বাড়ীতেও আসবে না। পরীক্ষার খবর বার হবার পরে তখন আসবে,—এখন থেকে বলে রাখলুম, দেখে নিস্‌।...যাক ভাববার কোন কারণ নেই! যখন লজ্জার ভয় ঢুকেছে, তখন আর পড়াশুনাতে গাফিলি করবে না।...আমার বোধ হয় নরেনও এই মতলবের ভিতরে আছে, নইলে শেষে আবার ওইটুকু লিখতো না। আর নরেনের মত বন্ধু আত্মজন যখন ভিতরে আছে, তখন যেখানেই যাক, আমাদের ভাবতে হবে না—খবরও আমরা পাব। এখন অনাদি-বাবুকে খবরটা জানিয়ে রাখা দরকার, কি বলিস্‌?"

—"নিশ্চয়, শুধু শুধু বেচারীর হয়রানী বাড়ে কেন?"

তড়িতার মুখখানা আরো বেশী মলিন হইয়া গেল।...কমলবাসিনী ভিতরে ভিতরে হাসিয়া উঠিতেছিলেন। তড়িতার ম্লানমুখচ্ছবি দেখিয়া তাঁহার অন্তরে সহানুভূতি আসিলেও, পরিণত বয়সে তরুণীর বাঞ্ছিত-বিরহের ব্যথা, তাঁহাকে স্নেহের দিক্‌ দিয়া অনেকখানি পুলকের মহিমা আনিয়া দিল!

———

দশম পরিচ্ছেদ

মাস দুই-আড়াই কাটিতে না কাটিতে, হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার ডাকে মাত্র দুই তিন ছত্র লেখা—নরেন্দ্রের একখানা পোষ্টকার্ডের চিঠি আসিল, এবং তড়িতা চিঠির মর্ম্ম অবগত হইয়া ক্ষুদ্র বালিকার মতই অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সারারাত্রি শয্যাকণ্টকে কাটাইয়া—ভোর হইতে না হইতেই তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য শেষ করিল এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে একাকী গিয়াই রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল,...তখন সবে কাক ডাকিতে সুরু করিয়াছে!

ঘণ্টা খানেক পরে উঠিয়া কমলবাসিনী যখন প্রত্যক্ষ করিলেন, তখন তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না, তড়িতার কাছে গিয়া—আশেপাশে চাহিয়া আশ্চর্য্যভাবে প্রশ্ন করিলেন—"আজ এ কি ব্যাপার রে! এত সকালে উঠে একলাটি—"

—"বল কি মাসি মা, আজ সকালের গাড়ীতেই দু'বন্ধুতে এসে পৌঁছুবেন, আজ কি বেলা পর্য্যন্ত বিছানায় পড়ে থাকবার সময় নাকি? গাড়ীতো এসে পড়্‌লো বলে! ভোর ভোর উঠে খাবার তৈরী করে না রাখলে তাঁদের দেব কি? সারাটি রাত গাড়ীতে জেগে কেটেছে. কষ্টও তো কম হয়নি! দেরী করলে যে বাড়ীতে এসেও কষ্ট পাবেন!"

আহ্লাদে কমলবাসিনীর মন নাচিয়া উঠিল, অধীরভাবে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—"ও কনক! কন্‌ক! শীগগির আয়, দেখে যা একবার! আর আমাদের নলিনের জন্যে ভাবনা করতে হবে না। তোর চেয়েও কত বড় গিন্নী

সংসারের ভার হাতে তুলে নিয়েছে—দেখে যা!" বলিতে বলিতে স্নেহের দৃষ্টি দিয়া তড়িতার লাজরক্তিম মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

কনকমালা আসিয়া আর্দ্র কণ্ঠে কহিলেন—"সেই প্রার্থনাই কায়মনে করি দিদি, তড়ি যেন তোমার স্নেহের ক্রোড়ে আশ্রয় পেয়ে, চিরদিনই এম্‌নি করে তোমার সংসারে গিন্নীপণা করতে পারে।...হতভাগীর জীবনে কোন সুখই মেটেনি।"...

কথাটার মর্ম্ম বুঝিতে কমলের বাকী থাকিল না। সহসা যেন কি একটা মনে করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই সামলাইয়া মিষ্ট অথচ গম্ভীর স্বরে কহিলেন—"মানুষের ক্ষুদ্র শক্তি—ক্ষুদ্র সাধনা! পরম দয়াল পরম পুরুষের ইচ্ছা যে কোন্ দিকে ধাবিত হবে, তা নিশ্চয় করে কেউ বলতে পারে না বোন্! যতক্ষণ যা হাতে আছে, তার কেবল বর্ত্তমান টুকুই নিয়ে সদ্ব্যবহার করবার আমরা অধিকারী। তদ্ভিন্ন ভবিষ্যতের গর্ভে দৃষ্টি দান করে, তার রহস্য নির্ণয়ের চেষ্টা করা সব মানুষেরই নিতান্ত অনধিকার চর্চ্চা।"

প্রবল স্রোতের মুখে হঠাৎ বাধা পড়িলে সে যেমন ফুলিয়া উঠিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়, কনকের বুকখানাও তেমনি একবার অভিমানে ফুলিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিল। মুহূর্ত্তকাল কমলের মুখের উপরে স্তব্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাঁহার হৃদয়ের তলদেশ পর্য্যন্ত দেখিবার চেষ্টা করিলেন। পরে, একটু হাসিয়া বলিলেন—"সত্যি দিদি, ভবিষ্যতের আলোচনায় অধীর হয়ে বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়। তবুও, বর্ত্তমানের উপরে সময়ে-সময়ে ভবিষ্যতের যে ছায়াটুকু এসে পড়ে, সেটুকু উপভোগ করবার আশা কে ছাড়তে পারে?...দুর্ভাগ্যের দিনে সেইটুকুই যে অনেকের জীবন-ধারণের অবলম্বন হয়ে ওঠে!"

কমল একটু অপ্রস্তুতভাবে মাথা নীচু করিয়া জবাব অন্বেষণ করিতে

লাগিলেন। কিন্তু তড়িতার সারা হৃদয়খানি লঘু বাতাসের মত এমন ফুর ফুর করিতেছিল যে, সে অতশত তলাইয়া বুঝিল না, ফস্ করিয়া বলিয়া উঠিল—"আজ কি তোমাদের কবিত্ব প্রকাশ করবার সময়, এক্ষুণি তাঁরা এসে পড়বেন যে!...শীগ্‌গির রাঁধবার জোগাড় করবে এস।...হাঁ মাসি মা, নরেনবাবু যে ক'দিন বাড়ী থাকবেন, এখান থেকে খেয়ে যাবেন তো? কেমন করে তাঁর আদর-যত্ন করতে হবে তুমি তা শিখিয়ে দিয়ো বাপু!"

কনক মনে মনে মেয়ের উপর ব্যাজার হইয়া উঠিলেন, কিন্তু কমলা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, তরল হাস্যে ঘর ভরাইয়া বলিলেন—"মেয়ের কাছে গেরস্থালী শেখ কনক, ভগবানের করুণা—যে এ রত্ন আমি কুড়িয়ে পেয়েছি! হিঁদুর ঘর হ'লে, এখুনি 'ঘরের লক্ষ্মী' বলে বরণ করে তুলতো। এখনকার এই নবীন যুগে, এই রকম উৎসাহময়ী নবীনা-দেরই স্থান ছেড়ে দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য।"

তারপরে, তড়িতার দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"আচ্ছা, আজ এই বন্ধু-দুটীর সকল ভারই তোর উপরে রইলো। দেখবো, নলিনের মত, নরেনকেও তোর পক্ষপাতী করে তুলতে পারিস কি না!...সে তো বেশী দিন ঘরে থাকতে পারবে না—ডাক্তার মানুষ, কলকাতা ছেড়ে এলে চলবে কেন? এ বছর তাতে আবার তার শেষ পরীক্ষা। তবে পিসীর বড় ব্যামো বলে হয় তো এখন প্রায়ই তাকে আসতে হবে।"

কনক একটা দুঃখের নিশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিন্তু ওই ভাইপোটি ছাড়া ওর পিসীর তো আর কেউ কোথাও নেই, মাগী ওকে ছেড়ে থাকবে কেমন করে?"

—"তা বলে মিছে মায়ার বশে ছোক্‌রার আখের নষ্ট করে দিতে বলিস না কি? এইটাই মানুষের দৌর্ব্বল্য।...উন্নতির পথে বাধা দেওয়া কারো

উচিত নয়, এবং নিজে মায়ায় পড়ে কারুর কোন কাজ নষ্ট করাও অকর্ত্তব্য।”

কমলবাসিনী সহসা এমন গম্ভীরভাবে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইলেন যে, কনক দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তড়িতা-সংক্রান্ত —মনের গুপ্ত আশাটুকুই শুধু যে চুরমার হইয়া গেল এমন নয়, তাঁহাদের আশৈশবের বন্ধনের ভিতরে সহসা একটা অনিশ্চিত ভয় ও সংশয় আসিয়া প্রাচীর তুলিয়া দাঁড়াইল। কমলকে পূর্ব্বের মত, আত্মীয়তার মধুর সম্বোধনে ডাকিতেও তাঁর আর ভরসায় কুলাইল না যেন!

কমল আনমনে কি ভাবিতেছিলেন, এদিকে লক্ষ্য করিলেন না! কিন্তু তড়িতা, মায়ের ক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়াই কাঁপিয়া উঠিল। সভয়ে ডাকিল—“মা, মা—”

কনক চমকাইয়া, বিপুল চেষ্টায় আত্মদমন করিয়া লইয়া কহিলেন— “কি মা? ওঃ—কথায় কথায় বেলা বেড়ে উঠেছে! তা' তুই ততক্ষণ রান্নার জোগাড় করতে থাক্, বড় মাথা ধরেছে—আমি ঝাঁ করে ডুবটা দিয়েই এসে পড়ছি।”

কমল শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন—“সে কিরে মাথা ধরেছে!...না-না তবে আজ আর আগুন তাতে গিয়ে তোর কাজ নেই কনক, কাল অনেক রাত অবধি জেগে একজামিনের কাগজগুলো দেখেছিস্, মেহনৎ তো বড় কম হয়নি! খানিক শুয়ে ঘুমোগে যা, সেরে যাবে। তড়ি রয়েছে, আমি রয়েছি, রান্নার ব্যবস্থা যা হয় হবেই।”

কনক কহিলেন—“ছেলেমানুষ, ও কি জানে যে রাঁধবে? তা ছাড়া তোমারও অভ্যাস কম---”

—“আমার কথা বাদ দে কনক! তড়িতা যা জানে, তাই খেয়েই নলিনের আমার সুখ্যাতি মুখে ধরে না।” বলিতে বলিতে অত্যধিক স্নেহে

তড়িতার মাথাটি আপন বুকের কাছে চাপিয়া ধরিলেন! তারপর চিবুক ধরিয়া আদর করিতে করিতে কহিলেন—"আমার নলিনের মন যে দুদিনে ভুলিয়ে দিয়েছে, সে কি সামান্য মেয়ে কনক? যা যা, তোকে কিছু দেখতে হবে না, ওর ঘর-কন্না ও যেমন ভাল বোঝে—তেমন কি তুইই বুঝবি?......কেমন মা তড়িতা! আমি দেখিয়ে দেব—তুই নিজের হাতে এমন করে রাঁধবি যে, তারা যেন নিত্যি এসে খোসামুদি করে!"...

লজ্জায়, সঙ্কোচে, উৎসাহে তড়িতা মুখখানি রাঙা করিয়া চোখ নত করিল। কিন্তু কনক অবাক হইয়া কমলের মুখের পানে চাহিলেন। এই যে ক্ষণে মেঘ—ক্ষণে আলোকবিকাশ, ইহার পরিণতি কোথায়? এই মেঘ-রৌদ্রের মাঝখান দিয়া তিনি তাঁহার আশার তরণীখানিকে কোন্ কূলের দিকে বাহিয়া লইয়া যাইবেন? এ যেন একটা বিরাট প্রহেলিকা তাঁহার বিকারগ্রস্ত মস্তিষ্কের ভিতরে কেবলই জমাট বাঁধিয়া নিবিড় হইয়া উঠিতেছে! যতই প্রাণপণ শক্তিতে—দুই হাতে অন্ধকার ঠেলিয়া আলোর দিকে এক এক পা আগাইতেছেন, ততই যেন ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্তের ধাক্কা আসিয়া তাঁহার চালিত চরণকে কাঁপাইয়া শক্তিহীন করিয়া তুলিতেছে!...

সদরে গাড়ীর শব্দ হইল। তড়িতা জানালার ধারে গিয়া, দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—"এই যে—এসে পড়েছেন ওঁরা—"

তারপরে কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়াই, চায়ের কেট্‌লী লইয়া তাড়াতাড়ি রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল।

ইতিমধ্যে নলিন নরেনের হাত ধরিয়া বাড়ীর ভিতরে টানিয়া আনিতে আনিতে প্রবল আনন্দের সহিত হাঁকিতে লাগিল—"মা! ওমা!—এদিকে এস—একটা ভয়ানক সুখবর আছে!...পাশ হয়েছি—আমি...নরেন—"

কিন্তু কমলবাসিনীর আর শুনিবার প্রতীক্ষা সহিল না, আহ্লাদে আটখানা হইয়া চঞ্চল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—"ও তড়ি—শীগ্‌গির

আয়, শীগ্‌গির আয়—সুখবর শুনে যা!...দেখ্‌লি—কনক! তড়ির পয়েতেই এবার নলিন আমার একজামিনে পাশ হয়েছে, আগে তাকে শীগ্‌গির ডেকে আন্‌।"

কমলের তাড়ায় কনক আর নিশ্বাস ফেলিবার সময়টুকুও পাইলেন না। দ্রুতপদে রন্ধনশালার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। সহসা নলিনের মুখখানা অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, মায়ের কথায় সায় দিয়া ফস্‌ করিয়া সে বলিয়া ফেলিল—"তোমার কথাই ধ্রুব সত্য মা; নইলে এবার আমার আশা মোটেই ছিল না।...নরেনও জানে—বরং জিজ্ঞাসা কর।" বলিয়াই সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া পড়িল।

———

একাদশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতা—অনাদিবাবুর বাড়ী।

পিতা পুত্রীতে কথাবার্ত্তা হইতেছিল—

"নরেন বাবুর বউকে একবার আনলে না বাবা—বড্ড দেখ্‌তে ইচ্ছে করে।"

—"আনবো মা।"

—"আর আনবে কবে? দু'মাস আগে থেকে তোমায় সাধছি, তবু তুমি গা করছো না।"

—"তখন কি আনবার সময় মা? নরেনের পিসীর ব্যামো অমন বেড়ে উঠেছিলো—"

—"তা, তেমন ব্যামোর সময়ে নরেন বাবু বিয়ে করতে পারলেন, আর আমাদের একবার বউ দেখাতেই বুঝি যত আট্‌কে গেল?'

—"বিয়ে কি তখন ইচ্ছে করে করেছে, নেহাৎ দায়ে ঠেকেই—"

—"ওই কথা শুনলেই আমার হাসি পায়, নিজের ইচ্ছে না থাকলে, দায়ে ঠেকে কেউ কখনো বিয়ে করতে পারে না কি?"

—"তুমি তো জান না মা—অমন ঢের হয়। নরেনের পিসী ভেবেছিলো—সে আর বাঁচবে না, তাই ভাইপোর বিয়ে দিয়ে বউ দেখে যাবার জন্য এমন কান্নাকাটি করে হুলস্থূল লাগিয়ে দিয়েছিলো যে, নরেন আর আপত্তি করতে পারে নি। তার উপর, ঘটনাচক্রে সেই সময়ে এমন একটা যোগাযোগ ঘটেছিলো যে, সে আর কিছুতেই এড়াতে পারলে না, কাজেই দায়ে ঠেকে

বিয়ে করতে হল। আর ধরতে গেল, এটা ঘটিয়ে দিলে আমাদের নলিন।"

—"এ তাঁর কিন্তু বড় অন্যায়, একজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে—বন্ধুত্বের দাবীর সুযোগ দিয়ে—"

—"না না, নলিনেরও দোষ দেওয়া যায় না। মেয়ের বিয়ের সমস্যা সকল সমাজের ভিতরেই আজকাল কঠোর হয়ে উঠেছে কি না। বিশেষ করে হিন্দু সমাজের তো কথাই নেই!...শুনেছি নরেনের সঙ্গে যার বিয়ে হ'য়েছে, সে মেয়েটির বাপ নেই, অবস্থাও তখন সচ্ছল নয়, সংসারে মা আর একটি মাত্র ছোট ভাই।—সে ওই নলিনদের কলেজের কাছেই এক কাঠের গোলায় সামান্য মাইনের চাকরি করে। মা ছাড়া অভিভাবক আর কেউ নেই।"

—"ওঃ—সেই একবার নলিনবাবু যে ছোকরাকে সঙ্গে করে এখানে এনেছিলেন, তোমাকে তাদের গোলা থেকে কাঠ কেনবার জন্যে সুপারিশ করেছিলেন—সেই ছোকরা না কি?"

—"হ্যাঁ—হ্যাঁ—সেই গোপাল মিত্তিরের ছেলে, তোর তো ঠিক মনে আছে দেখছি?"

"বাপ—রে!—সে কথা আর মনে থাকবে না! সে যে মস্ত হাসির ব্যাপার! ওই টুকু ছেলে—তার গোঁড়ামি কত! আমাদের বাড়ীতে কিছুতেই ভাত খেলে না, শেষে নলিন বাবু সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে কোন বামুনের হোটেল থেকে খাইয়ে নিয়ে এলেন। সেই তিনিই নরেন বাবুর শালা তো?"—বলিতে বলিতে বিজলী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অনাদিনাথ কহিলেন—"নলিনের সঙ্গে কে জানে কেমন করে, ওদের বড্ড ভাব হয়ে গেছে। ওর মা প্রায়ই তাকে নেমন্তন্ন করতো, ছেলের হাত

দিয়ে খাবার দাবার তৈরী করে কলেজে পাঠিয়ে দিতো। তা ছাড়া নলিনও বোধ করি মাঝে মাঝে যাওয়া আসা করতো।"

বিজলীর মুখখানা হঠাৎ বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল, কহিল—"এই সব ভণ্ডামী গুলোই আমি মোটে সহ্য করতে পারিনে বাবা!...ছেলেটার জ্যাঠামী দেখেছিলে তো?—ওঃ বাবু যেন কতই ধার্ম্মিক!......এত অনুরোধ করা গেল—এক গ্লাস জল পর্য্যন্ত এ বাড়ীতে খাওয়া হ'লনা।... ...যতসব বকধার্ম্মিকের দল!......কিন্তু নরেন বাবুই বা এত সহজে রাজী হ'লেন কি করে?"

অনাদিনাথ হাসিয়া জবাব করিলেন—"তুই আচ্ছা পাগল বিজলি!—আগে বিয়ের Romanceটাই শুনে নে! মস্ত বড় একটা Plot;...কথাবার্ত্তা ঠিক-ঠাক সবই আর একটি পাত্রের সঙ্গে হ'য়েছিলো! কিন্তু গায়-হলুদের দিন হঠাৎ পাত্রের বাড়ী থেকে খবর এল যে, ছেলে পালিয়েছে—বিয়ে করবে না।"

—"এ্যাঁ, বল কি বাবা?"

—"হ্যাঁ মা—এমন ঢের হয়, এই রকমে কত লোকেরই যে সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে!...সামাজিক ব্যাপারে এরকম হ'লে জাতিপাত হ'য়ে যায়!... সবচেয়ে এইটেই হিন্দুসমাজের বড় দোষ। বিশেষ—যদি মেয়ে ডাগর আর অবস্থা গরীব হয়, তা হ'লে তো সমাজপতিদের বিচারের কোন ত্রুটিই পাওয়া যায় না! হ্যাঁ,......তারপর শোন......পাত্র যখন হাত ছাড়া হ'ল, তখন বিধবার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। অভিভাবকও তেমন কেউ নেই, যা কিছু সংস্থান ছিল সব খরচ পত্র করে বিয়ের জোগাড় করেছে—তার উপর মেয়েরও বয়স হয়েছে—রাখতেও পারে না। নানা জনে নানা কথা কইতে লাগলো। বেচারীতো ভাবনায় পাগলের মত হয়ে উঠলো। শেষে, লোকের হাসি টিট্‌কারীতে অধীর হয়ে স্থির করলে যে, নলিনের সঙ্গে

বিয়ে দিয়ে হিন্দুসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দেবে। এই ভেবে নলিনকে সব কথা জানালে, কিন্তু—নলিন তো সে রকম ছেলে নয়, মা বাপের অমতে কোন কাজই তার দ্বারা হওয়া অসম্ভব। কাজেই বিধবা, ছেলেকে সঙ্গে করে চাত্‌রায় গিয়ে নলিনের মায়ের পা জড়িয়ে কেঁদে পড়লো।"

—"কি বিপদ, তিনি করলেন কি?"

—"তাঁকে বেশী কিছু করতে হয় নি, বরাবরই নলিন ওদেরকে ভাল ভাবে দেখাশুনা করতো, নলিন তক্ষুনি নরেনের পিসীর কাছে গিয়ে ধরে বসলো আর কি! সে বুড়িও আবার নলিনকে বড্ড ভালবাসে, তার উপর বউ দেখবার সাধ হয়েছে, কাজেই অমত করতে পারলে না।...আর নলিনের সঙ্গে নরেনের কি রকম বন্ধুত্ব জান তো—সে কি আর ওর কথা ঠেলতে পারে? বিশেষ করে, বিধবার সেই বিপদের কথা শুনে, রাধিকাবাবু আর তাঁর স্ত্রীরও মন গলে গেল; তাঁরা মাঝে পড়ে, গরীবের জাত রক্ষা করে দিলেন, নরেন আর কথাটি কইতে পারলে না।...হঠাৎ তাড়াতাড়ি ব'লে বিয়েতে আমোদ প্রমোদ কিছুরই ব্যবস্থা হয়নি।...সময় মোটেই ছিল না কিনা।"

—"মেয়েটি খুব সুন্দরী বুঝি—তুমি দেখেছ তাকে?"

—"আমি আর দেখলুম কবে, তবে শুনেছি—মন্দ নয়।...তা রূপেতে কি করে মা—গুণ তার ঢের। হাজার হোক গরীব ভদ্রঘরের বয়স্থা মেয়ে কি না, নিজের অবস্থা সব বুঝতে পারে তো!...বিয়ের কনে গিয়ে পিস্‌-শাশুড়ীর অবস্থা দেখে, তিন মাসের ভিতরে আর বাপের বাড়ী যাবার নাম পর্যান্ত করেনি, তার উপর এমন সেবা করেছে যে, তার সুখ্যাতি লোকের মুখে মুখে ধরে না। বুড়ী তো বৌয়ের গুণে একেবারে গলে গেছে, যে দিন পথ্য করেছে সেই দিনেই নিজে থেকে জোর করে তাকে বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই সব হাঙ্গামে পড়ে, নলিনকেও ছুটীর কটা দিন যা

বাকী ছিল, তা বাড়ীতেই কাটাতে হয়েছে, এখানে আর আসতে ফুরসৎ পায়নি ; কলেজ খুলতেই বরাবর শিবপুরে চলে গেছে।" বলিয়া অনাদিনাথ আড়চোখে মেয়ের মুখের পানে তাকাইলেন, কিন্তু বিজলী তখন মুখ ফিরাইয়া লইয়া একখানা কবিতার পুস্তকের উপরে মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছিল।...আর জমাটি ভাবে আলাপ জমিবে না বুঝিয়া, অনাদিনাথ পোষাক বদলাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বিজলী বইখানার পাতা উলটাইতে, হঠাৎ এক জায়গায় থামিয়া ক্ষণকাল কি দেখিল, তারপরে পুস্তক রাখিয়া দিয়া, টেবিল-হারমোনিয়মে বসিল।

দুই চারিবার হারমোনিয়মের পরদায় মৃদু মৃদু করাঙ্গুলির আঘাত করিয়া গাহিতে গাহিতে, শেষে সহসা করুণ সুরের ঝঙ্কার তুলিয়া গাহিল—

"এত প্রেম-আশা, প্রাণের তিয়াসা কেমনে আছে সে পাসরি ?
ওগো, সেথা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী—
সেথা কি বাজে না বাঁশরী ?
হেথা সমীরণ লুটে ফুলবন,
সেথা কি পবন পশে না,—
সে যে, তার কথা মোরে কহে অনুখন,
মোর কথা তারে কহে না ?"

সহসা—বাধা পড়িল ! ভৃত্য ঘরে ঢুকিয়াই শঙ্কিতভাবে বলিয়া উঠিল—"শীগ্‌গির আসুন দিদিবাবু, মটরগাড়ীর ধাক্কা লেগে আমাদের গাড়ী ভেঙে গেছে, কর্ত্তাবাবুর চোট লাগেনি, কিন্তু কেমন ধারা হয়ে গেছেন।"

—"কি সর্ব্বনাশ—"বিজলী আর একটা কথাও উচ্চারণ করিতে পারিল না! দারুণ রোদনের ভারে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হইতেছিল। ভৃত্যকে একটা কথাও না জিজ্ঞাসা করিয়া সে ঘর ছাড়িয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।...

...অনেকদিন নলিনকে না দেখিয়া অনাদিনাথ মনে মনে চঞ্চল হইয়া

উঠিয়াছিলেন। নরেন্দ্রের বিবাহের ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া সে কলিকাতায় আসিতে পারে নাই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলেও, নলিন যখন বাড়ী হইতে বরাবর শিবপুরে চলিয়া গিয়াছিল, তখন তাহার সেই উপেক্ষাটুকু তাঁহার অন্তরে দস্তুর মত আঘাত করিতে ছাড়ে নাই। পরে যখন ক্রমে ক্রমে চার পাঁচ মাস কাটিয়া চলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নলিনের চিঠিপত্রের আদান-প্রদানও বিরল হইয়া আসিতে লাগিল, তখন সেই আঘাত বৃদ্ধের বুকে এমন করিয়াই বাজিল যে, অদ্যই কন্যার সহিত কথোপকথনের সময় তাহার প্রসঙ্গ উঠিতেই, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তাহাকে দেখিবার জন্য তৎক্ষণাৎ শিবপুরে চলিলেন। কিন্তু তাঁহার সে আশাতো মিটিলই না, অধিকন্তু জীবন লইয়া টানাটানি পড়িল।

...বিজলী সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার আনাইয়া রীতিমত চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিল, এবং অনাদিবাবুর আহত মনটুকু খুব কম সময়ের মধ্যেই তাজা হইয়া উঠিল!...তাঁহার আশঙ্কাই বেশী হইয়াছিল, আঘাত গুরুতর হয় নাই।

* * * * * *

নানারকম গোলমালের জন্য অধুনা নরেন্দ্রকে তার কলিকাতার বাসা উঠাইয়া রামকৃষ্ণপুরে বসবাস করিতে হইতেছে। তাহার স্ত্রী উমাশশীর চাতরা হইতে পিত্রালয়ে আগমনাবধি, অভিভাবকহীন বলিয়া, শাশুড়ীর অনুরোধে নরেন্দ্রকে শ্বশুরালয়ে থাকিয়াই কলেজে শেষ আনাগোনা করিতে হইতেছিল। হাঁসপাতালের বৈকালিক ডিউটী করিয়া নরেন্দ্র গৃহে ফিরিতেই, উমা তাড়াতাড়ি গিয়া স্বহস্তে স্বামীর পোষাক ছাড়াইয়া মুখ-হাত ধুইবার জল দিল। নরেন্দ্র হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া বসিলে, উমা চঞ্চল হস্তে ঠাঁই করিয়া জলখাবার দিয়া, একখানা পাখা লইয়া স্বামীকে বাতাস করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল—"নলিনদার কোন খবর পেয়েছ?...আজ কি কোম্পানীর বাগানের দিকে গিয়েছিলে?"

—"না আজ সময় পাইনি।"

—"আজ তো রবিবার গেল, কিন্তু নলিনদা আজও তো এলেন না?"

নরেন্দ্র এবার হাসিয়া বলিলেন—"তার দোষ নেই, উমা!...আস্‌তে সে সময় পায়নি।"

উমা মুখ ভার করিয়া বলিল—"আজ চার মাস হতে চল্লো আমি এখানে এসেছি। আমি আসবার আগেই, সেই যে ছুটী ফুরোতে তিনি বাড়ী থেকে কলেজে চলে এসেছেন, সেই থেকে এত দিনের ভিতরেও কি একবার এখানে আসবার সময় পেলেন না? তাঁর কলেজ থেকে এই রামকৃষ্ণপুর তো বেশী দূর নয়, ইচ্ছা থাকলে কি আর একটা দিন এসে আমাকে দেখে যেতে পারতেন না?"

—"তারও কারণ আছে, আমি প্রায়ই গিয়ে দেখা করে আসি বলে, সে আর আসবার তত দরকার মনে করেনি।"

—"তুমিও তো আজ একমাস হল যাবার সময় পাওনি?"

—"তা হলেও, হালে তার একটা ক্লাসের একজামিন গেছে। তারপর বছর ফুরিয়ে এলো, আবার ফাইনাল্ একজামিনের সময় ঘনিয়ে আসছে;... ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজের ঝঞ্ঝাট ঢের—"

—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ" বলিয়া তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া উমা চঞ্চলকণ্ঠে কহিল—

—"তোমারও তো ঝঞ্ঝাট কম নয়—নাবার-খাবার সময় পাও না তার উপর চারদিকে ডাকের ঠেলায় অস্থির! তবুও তুমি তো যেতে পেরে-ছিলে, আর তিনি কি একটিবার আসতে পারতেন না?...ও সব আমি বুঝি। তোমার বন্ধু—তুমি তো তার হয়ে বলবেই! কিন্তু আমি বুঝেছি! হাজার হোক আমি তো তার মার পেটের বোন্ হবার সৌভাগ্য পাইনি! আমার উপর দরদ থাকবে কেন তার?...পর যারা, তাদেরকে ভুলে যেতে কতক্ষণ?"

—"নারে পাগ্‌লি—না, সে কক্ষণো ভুলে যেতে পারে না। এই বিষয়ে আগে পর্য্যন্ত কত কথাই তোমার সম্বন্ধে যখন-তখন আমার কাছে বল্‌তো। তারপরে, সে না কাছে থাকলে এ রত্ন আমি পেতুম কোথায়? শুধু তার জন্যই—"নরেন্দ্র কথাটা আর শেষ না করিয়াই, সহসা স্নেহভরে পত্নীর হাত দু'খানি ধরিয়া নিজের দিকে আকর্ষণ করিল। উমার মুখখানা গোলাপের মত লাল হইয়া চক্ষু দুটি মাটীর দিকে নামিয়া পড়িল। কিন্তু পরক্ষণেই বাধা দিয়া—হাত দুখানা টানিয়া লইতে লইতে—শশব্যস্তে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিয়া উঠিল—"ছাড় ছাড়...মা—"

নরেন্দ্র পত্নীর হস্ত ত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি সামলাইয়া বসিল এবং উমাও মাথার কাপড় খানিকটা বেশী নামাইয়া দিয়া ত্বরিত হস্তে পতির উচ্ছিষ্ট মুক্ত করিতে বসিল। পরমুহূর্ত্তেই মেয়ের নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে নরেন্দ্রের শাশুড়ী ঘরে ঢুকিয়া দু'খানা খামে মোড়া চিঠি তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—"এখানা এই মাত্তোর ডাকওলা দিয়ে-গেল, আর এখানা একজন লোক সকালবেলা দিয়ে গিয়েছিলো সতীশের কাছে, সে তখন কাজে যাচ্ছিলো বলে তাড়াতাড়ি ভুলে পকেটে করেই নিয়ে গিয়েছিলো। এবেলা কাজ থেকে ফিরে এসে আমার কাছে দিয়েছে।" তারপর কন্যার দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"আমি একবার ঠাকুরবাড়ীতে যাচ্ছি উমি! ফিরতে বেশী দেরী হবে না, বামুন পিসী দাঁড়িয়ে রয়েছে।" বলিয়া, বাহির হইয়া গেলেন। উমাও মাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেল, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই ফিরিয়া আসিয়া আগ্রহভরে প্রশ্ন করিল—"কার চিঠি?"

নরেন্দ্র জবাব না করিয়া একখানা চিঠি তাহার হাতে দিল। উমা চোখ বুলাইয়াই বলিয়া উঠিল—"এ্যাঁ, আবার পিসীমার শক্ত ব্যামো! এই কত কাণ্ড করে সেদিন সবে সেরে উঠলেন—"

—"বুড়ো বয়সের রোগ—বিশ্বাস তো নেই, জোড়া-তাড়া দিয়ে যে

ক'দিন রাখতে পারা যায়! যখন আবার:রিল্যাপ্স্ করেছে, তখন নিশ্চয়ই ভয়ের কথা!"

—"ও মা কি সর্ব্বনাশ! কি হবে তা' হলে?"

—"যেতে হবে, আর কি—" বলিতে বলিতে, নরেন্দ্র দ্বিতীয় চিঠিখানি পড়িয়াই, চঞ্চল ভাবে কহিল—"ওদিকে আবার তড়িতার মায়েরও বাড়াবাড়ি ব্যামো—বাঁচে কি না! নলিন খবর পেয়েই লিখে পাঠিয়েছে। তার তো নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই।... তা'হলে আর দেরী করা চল্লো না। ব্যাগে আমার থান দুই কাপড় আর ওই ওষুধের বাক্সটা গুছিয়ে রাখ, ...কাল—"

—"আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

—"সে কি! এই সেদিন সবে এলে!"

—"তা হোক, পিসীমার সেবা করতে না পেলে আমার মনে বড় দুঃখ থাকবে।"

———

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

তড়িতার মাতা রোগের আক্রমণে পড়িয়া দিনে দিনে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। আজকাল পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে হইলেও, কন্যা বা অন্য কাহারও সাহায্য লইতে হয়।...তড়িতার সদা প্রফুল্ল মুখ দুঃখ-কালিমায় মলিন হইয়া গিয়াছে!...দারুণ মাতৃবিচ্ছেদের আসন্ন আশঙ্কায় তাহার কোমল বুকখানা নিমেষে নিমেষে বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছিল।

তড়িতা ঔষধের গ্লাসটা মায়ের বুকের কাছে ধরিতেই কনক বিরক্ত হইয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন—"ও ছাই পাঁশ আর আমি গিলবো না, কথা শোন্ মা—চিকিৎসাপত্র বন্ধ করে দে! যা দু-পাঁচ টাকা পুঁজি ছিল সে সবই তো গেল, এখন আর ধার-কর্জ্জ করে"—বলিতে বলিতে কনকের কণ্ঠস্বর বাষ্পভারে অবরুদ্ধ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে রোগপাণ্ডুর শুষ্ক গণ্ড বহিয়া ফোঁটাকতক তপ্ত চোখের জল টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

তড়িতা মাতার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, প্রবীণা জননীর মত—সন্তর্পণে অঞ্চলাগ্রে চোখ মুছাইতে মুছাইতে আশ্বাসভরা কণ্ঠে কহিল—"ভয় কি মা! শীগ্‌গির সেরে উঠবে। ডাক্তারবাবু বলেছেন—ফিট্‌টা যদি আর না হয় তাহলে ভয়ের কারণ মোটেই নেই।"

—"ডাক্তার তো অন্তর্যামী নয় মা, যে আমার ভিতরের খবর জানতে পারবে?"

কনক শুষ্ক অধরে ঈষৎ ম্লান হাসি ফুটাইয়া কন্যার মুখের উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন, তারপরে ধীরে ধীরে তাহার একখানি হাত ধরিয়া

বলিলেন—"আমি বেশ বুঝতে পারছি মা, এবার আমার ডাক পড়েছে। পৃথিবীর কোন ডাক্তার, কোন ওষুধ দিয়েই এবার আর আমায় ফেরাতে পারবে না।...তবে—"

কথা শেষ হইল না। কমলবাসিনী বাহির হইতে গৃহে ফিরিয়া, কনককে দেখিতে আসিতেছিলেন। তাঁহার কথাগুলা কানে যাইতেই, উত্তপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ি—এই একটা তোর মহৎ রোগ কনক! ব্যায়রামটা একটু কঠিন দাঁড়িয়েছে বটে, কিন্তু এ রকম কঠিন ব্যামো কি মানুষের হয় না—না সারছে না?"

কনক আবার ঠোঁটের কোণে বিদ্যুতের মত চকিত ম্লানহাসি ফুটাইয়া জবাব করিলেন—"মানুষের ব্যামোও হয়, আবার তা সারেও দিদি, কিন্তু দিন ফুরিয়ে এলে আর কেউ তাকে ধরে রাখতে পারে না। যাবার যে দিন যার ঠিক হ'য়ে রয়েছে, তার আর এদিক্'ওদিক্ হয় না।"

বলিতে বলিতে রোগিনী অত্যন্ত ক্লান্তভাবে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ম্লান দৃষ্টিতে আশ্রয়দাত্রীর মুখের পানে চাহিলেন। সেই চাহনির সম্মুখে কমলবাসিনী আর কিছুতেই আপনাকে খাড়া রাখিতে পারিলেন না। ভিতরে ভিতরে একটা ভারী দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া, তাঁহার নেত্রপল্লবও যেন কিসের ভারে আপনা হইতেই অবনত হইয়া পড়িল। তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া অন্যমনস্কভাবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রিয় সখীর প্রতি করুণাসিক্ত মন ও স্নেহটা যে কোথায় কোন মুখে কি অবস্থায় রূপান্তরিত হইয়া গেছে আজ সেইটাই তাঁহার মনে জাগিল।

চোখের সম্মুখে হঠাৎ যখন কোন নির্ম্মম সত্য মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দেয়, তখন যত বড় নির্ম্মম, যত বড় শক্ত মানুষ হউক না কেন, অন্ততপক্ষে একবারের জন্যও মনে মনে না কাঁপিয়া থাকিতে পারে না। কনকের রোগপাণ্ডুর মুখের ম্লান দৃষ্টির সম্মুখেও কমলবাসিনীর তাহাই হইল।

বাল্যসহচরীর কথার ভিতর দিয়া যে ধ্রুব সত্য অত্যন্ত সরল—নগ্নদেহে বাহির হইয়া আসিল, তাহার দিকে চাহিয়া তিনি একবার সভয়ে মনে মনে কাঁপিয়া উঠিলেন, তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, এই দুর্ভাগিনী বাল্যসঙ্গিনীটাকে অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত আশায় উত্তেজিত করিয়া, শেষে তাহার মূলে কুঠারাঘাত করাতেই তাহার জীবনের গ্রন্থি আচম্বিতে এমন ভাবে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে! সহসা বিবেকের একটা তীব্র কসাঘাতে তাঁহার অন্তর মুহূর্তের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল! কিন্তু সে ওই মুহূর্তেরই জন্য! পরক্ষণেই আত্মদমন করিয়া কহিলেন,—"প্রথম থেকেই ওরকম নিরাশা ধরে থাক্‌লে সকল বিষয়েই খারাপ হবে কনক! যদি সত্যিই সময় হয়ে থাকে, তাহলে কেউ যে ধরে রাখতে পারবে না, সে কথা সত্যিই। কিন্তু কাল মরবো বলে,—আজ যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ জ্ঞান থাক্‌তে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা না করলে—শুধু আত্মীয়-স্বজনের কাছে নয়, ভগবানের কাছেও পাতকভাগী হ'তে হয়।...জীবন এমনি মূল্যবান্—"

বলিয়াই, মুখখানাকে থমথমে করিয়া কমলবাসিনী বিরক্তিভরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সে ভাব দেখিয়া, কনক মনে মনে ভয়ে কাঁপিয়া মেয়েকে বলিলেন—"যা মা তড়ি! এখন আমার আর কিছুই দরকার নেই। দিদি তেতে-পুড়ে ঘরে এলেন, তুই তাঁর কাছে গিয়ে যা পারিস সাহায্য করগে...যা!"

কনক একটা বেদনার নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তড়িতা কি-একটা কথা বলিতে গিয়াও মাতার মুখের দিকে তাকাইয়া থামিয়া গেল; তারপরে সজল চোখ দুটি আঁচলে মুছিতে মুছিতে, একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া, এক-পা এক-পা করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে রন্ধন-গৃহে তড়িতা, সদ্যপ্রস্তুত ভাতের হাঁড়ি নামাইয়া, কড়ায় করিয়া মাছ সাঁতলাইতে যাইতেছিল। কমলবাসিনী তথায় গিয়া

তাহাকে দেখিয়াই বিরক্তিভরে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"বলি, আচরণটা কি তোর! কে তোকে গিন্নীপণা করে হেঁসেলে এসে ঢুকতে বলেছে? রেখে দে ওসব ফেলে! যা তুই, তোর রুগীর বিছানা আগ্‌লে বসে থাক্‌গে যা।"

ধমক খাইয়া তড়িতা জড়সড় হইয়া গেল। তাহার বুক ঠেলিয়া একটা রোদনের উৎস চোখের পথে ছুটিয়া বাহির হইতে আসিল!...উঃ—এই কি সেই স্নেহশীলা নারী! যে 'মা তড়িতা' বলিতে অজ্ঞান হইত!—আজ কোথায় সে অনাবিল মাতৃ স্নেহ! চেষ্টায় কোন মতে আত্ম দমন করিয়া, সভয়ে আস্তে আস্তে বলিল—"এত বেলায়, এখন রাঁধতে গেলে যে তোমার ইস্কুলের বেলা হয়ে যাবে—"

কমলবাসিনী অধিকতর তিক্তকণ্ঠে খর খর করিয়া কহিলেন—"অত দরদ যদি, তা হলে আর এই দুমাস ধরে আমাকে এত নাটা ঝামটা খাওয়াতে না বাছা!...দুবেলা দুটো রেঁধে দিয়ে আমাকে চরিতার্থ করছো আর কি! এই যে মাগী এতকাল ধরে শয্যাগ্রহণ করে নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছে, তা ইস্কুলটার জন্য একটু ভাবনা চিন্তা আছে কি?...যা যা—তোকে কিছুই করতে হবে না।" বলিতে বলিতে, কমল তড়িতাকে ঠেলিয়া দিয়া, তাহার হাত হইতে মাছের কড়াখানা কাড়িয়া লইয়া, আপনা আপনি কথার বিষ ঢালিতে লাগিলেন—

"এমন কিছু নয় যে আজই মরছে! তবু দিন-রাত্তির সকল কাজকর্ম্ম ফেলে ঘর আগ্‌লে বসে আছেন! বুড়ো মাগী হতে চল্লেন, দিন দিন জ্ঞান বুদ্ধি বাড়ছে খুব! মায়ের না হয় ক্ষমতা নেই, কিন্তু তুই রোজ ঘণ্টা দুই করে গিয়ে নীচের ক্লাস গুলোতে পড়িয়ে এলেও একটু উপকার হয়, তা—না। যত দরদ দেখাতে আসেন কেবল দুবেলা দুমুঠো সিদ্ধ করে দেবার বেলা! তাতে নিজের স্বার্থ আছে কি না?...হবে না কেন?—যেমন গাছ ফলও

তো তেমনি হবে!...মাগী তো সবজান্তা হয়ে একেবারে অনন্তশয্যা নিয়েছেন, আর মেয়েও তেমনি—"

তড়িতা আর শুনিতে পারিল না। আঁচলের মুঠা জোর করিয়া মুখে চাপিয়া ধরিয়া, কোন মতে রোদনের বেগ সম্বরণ করিতে করিতে দ্রুতপদে নলিনের ঘরের ভিতরে পলাইল। তারপরে দরজা ভেজাইয়া দিয়া ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বড় কান্না কাঁদিল।...

কনক পীড়িত হইয়া পড়া অবধি তড়িতার বিশ্রাম বা অবসর এক দণ্ডের জন্যও মিলিত না। মাতার সকল কর্ত্তব্য আপন স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া, সংসারের সকল কাজকর্ম্ম সারিয়া রোগিণীর ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিতে করিতেই তাহার দিন কাটিয়া যাইত। তাহারই ভিতরে যখন যেটুকু অবসর পাইত, সেইটুকু সময়ের জন্যই মাতার কাছে গিয়া বসিত। ইহাতে তাহার নিজের পড়াশুনাতো বন্ধ হইয়া গিয়াইছিল, অধিকন্তু এমন একটু সময় মিলিত না যে, নলিনকে একখানা চিঠি লিখিয়া এই বিপদের সংবাদ জ্ঞাপন করে।

বিদায়কালে, নলিন তাহাকে চিঠি লিখিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিয়া কতকগুলি কাগজ, খাম প্রভৃতি গছাইয়া দিয়া গিয়াছিল। তবুও তড়িতা প্রকাশ হইবার ভয়ে নিতান্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও, দুই একবার আবশ্যকীয় সাংসারিক সংবাদ ভিন্ন, নিজে কিছু লিখিতে সাহস করে নাই, কিন্তু আজ যে নির্ম্মম আঘাতে তাহার মর্ম্মস্থল ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, তাহাতে সে তাহার কাছে মাতার জীবন-সঙ্কট পীড়ার কথা না লিখিয়া থাকিতে পারিল না। লিখিত চিঠিখানা লুকাইয়া লইয়া পোষাক পরিবর্ত্তন করিল, তারপর কমলবাসিনীর বাহির হইবার আগেই, মাতাকে একবার দেখিয়া বাহির হইতে প্রস্তুত হইল। তাহার বাহিরে যাইবার পোষাক দেখিয়া কনকমালা একটু আশ্চর্য্যভাবে প্রশ্ন করিলেন—"এমন সময় কোথায় যাচ্ছিস মা,

বাহিরে কোন কাজ আছে ?" মলিন মুখখানাকে সহজ করিবার চেষ্টা করিতে করিতে তড়িতা জবাব দিল—

—"ইস্কুলে, নীচের ক্লাশগুলোতে না পড়ালে চলে না, তোমার অনেক দিন কামাই হয়ে গেছে।" বলিতে বলিতে তড়িতার গলা ভারী হইয়া আসিল, মুখ নীচু করিয়া আরো কি কথা চাপিয়া লইল। পরক্ষণেই চলিয়া যাইতে যইতে সহসা আবার চমকিয়া দাঁড়াইয়া [illegible]রার আকুল দৃষ্টিতে মায়ের পানে চাহিল। কমলবাসিনী যে ভাবে তড়িতাকে [illegible]রস্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার একটা কথাও রোগিণীর শ্রুতি এড়াইয়া যায় নাই। কনক অতিকষ্টে একটা উচ্ছ্বসিত অশ্রুর আবেগ দমন করিয়া ক্ষীণস্বরে কহিলেন—"যা মা, তাই যা, আমার আর কিছুরই দরকার হ'বে না। সবই তো হাতের কাছে গুছিয়ে রেখেছিস—আমি আপনিই টেনে নিতে পারবোখন, সংসারে যিনি সকল সহায়-সম্পদ হতে বঞ্চিত করেছেন, তিনিই অনাথার সহায় হয়ে সদাই সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন, আমার জন্য তুই কিছু ভাবনা করিসনি।"

তড়িতা যে একটা প্রবল অশ্রুর উচ্ছ্বাস চাপিয়া বাহির হইয়া গেল, তাহা বুঝিতে কনকের বাকী থাকিল না। কিন্তু তবুও মায়ের প্রাণ!— নিদারুণ বেদনার গুরুভার চাপিয়া বুকখানাকে চূরমার করিয়া দিতেছিল' কিন্তু তাহার আভাসমাত্রও কনক জানাইতে সাহস করিলেন না। মেয়ের বেদনাকাতর অভুক্ত শুষ্ক মুখখানি কেবলই মনে জাগিয়া তাঁহার রোগ-শয্যাতীক্ষ্ণ কণ্টকশয্যা বলিয়া মনে হইতেছিল। রোগজীর্ণ হৃদয়ে এই অসহ্য আঘাত মুখ বুজিয়া সহিতে গিয়া অন্তিমের দিনটাকে তিনি এতই কাছে টানিয়া আনিলেন যে, প্রতি মুহূর্ত্তেই পরপারের ক্ষীণ আহ্বান তাঁহার কাণে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল।

* * * কমলবাসিনী ইস্কুলে গিয়া তড়িতাকে কনকের স্থানে কার্য্য করিতে

দেখিয়া মনে মনে কেবলমাত্র ঈষৎ ক্রূর হাসি চাপিয়া লইলেন, কিন্তু তড়িতা যে সমস্ত দিনটা কি অধীরতায় কেমন করিয়া কাটাইল, তা' তার অন্তর্যামীই বলিতে পারেন! বিকালে গৃহে ফিরিয়াই সর্ব্বাগ্রে মাতার ঘরে ঢুকিয়া যে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল, তাহাতে তাহার অন্তরাত্মা ভয়ে উড়িয়া গেল, অভুক্ত শুষ্ক মুখখানি একেবারে মড়ার মত সাদা হইয়া গেল! আশঙ্কায় উদ্বেলিত অন্তরে অধীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—"একি মা, সারাদিনের ভিতরে জলরত্তিও ছোঁওনি যে!"

বলিতে বলিতে নিরাশভাবে পথ্যের দিকে চাহিতেই, তাহার দুটি চোখ ছাপাইয়া গোটাকতক বড় বড় জলের ফোঁটা টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

মেয়ের মুখপানে চাহিয়া কনক, প্রাণপণ চেষ্টায় একটুখানি ম্লান ভাবে হাসিতে গিয়াও পরিলেন না, কেবল জ্বলন্ত আগুনের মত একটা বিষম উত্তপ্ত নিশ্বাস তাঁহার অন্তর্দাহটুকুকে বাতাসে জড়াইয়া বাহির হইয়া গেল। অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে টানিয়া টানিয়া কহিলেন—"মু—খে—এ—ক—টু—জল"

কিন্তু তড়িতা আর এক পাও নড়িতে পারিল না। একটুখানি দাঁড়াইয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে ধপ করিয়া বিছানার উপর বসিল, তারপর উপুড় হইয়া মাতার মুখের উপরে ঝুঁকিয়া কাতরকণ্ঠে ডাকিল—"মা—মা—মাগো!"

কনক মুহূর্ত্তকাল নীরবে চোখ বুজিয়া রহিলেন, তারপরে একটা লম্বা নিশ্বাস ছাড়িয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন—"বোঝবার ভুলে সর্ব্বনাশ করেছি মা, তোকে একেবারে পথে দাঁড় করিয়ে চল্লুম।" বলিতে বলিতে ক্ষীণ কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল! কোটরগত চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া আসিল। তড়িতা তাড়াতাড়ি মায়ের চোখের জল মুছাইতে মুছাইতে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিয়া উঠিল—"মা মা, অমন কথা আর বোলো না—মা! আমি যে তাহলে

দশদিক অন্ধকার দেখি! তুমি আবার সেরে উঠ্‌বে না, এ আশাটুকু আমার ভেঙ্গে দিও না—তোমার পায়ে পড়ছি।”

বলিয়া মায়ের চোখের জল মুছাইতে মুছাইতে আপনিই ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কনক মুহূর্ত্তকাল কন্যার মুখের পানে চাহিয়া, ধীরে ধীরে একহাত তুলিয়া তাহার কণ্ঠে স্থাপন করিলেন, পরে তেমনি ধীরে ধীরে তাহার মুখখানিকে নিজের বুকের উপরে টানিয়া লইয়া, শুষ্ককণ্ঠে হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিলেন—“আশা করিসনি তড়ি, আশা করতে নেই!—গরীবের আশা এ পৃথিবীতে মেটে না।...যে যেমন মানুষ, তার তেমনি ভাবেই থাকা উচিত—নইলে ঈশ্বর বিমুখ হন। আজ যে আশার ছলনায় ভুলে, আমি তোর সর্ব্বনাশ করে গেলুম মা—”

হঠাৎ গলার ভিতরে একটুখানি ঘড় ঘড় শব্দ উঠিয়া কথা আট্‌কাইয়া গেল। তড়িতা চম্‌কাইয়া উঠিয়া শশব্যস্তে দুধ গরম করিতে যাইতেই, কনক সাম্‌লাইয়া, বাধা দিয়া বলিলেন—“ও কিছু নয় মা, একটা কফের দমক্, কেটে গেছে! তোর জন্যে—”

এবার তড়িতা সহসা একটা অস্বাভাবিক বলে আত্মদমন করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিল—“অমন করে বলোনা মা, আমার জন্যে কিছুমাত্র ভেব না। এ অবস্থায় অত ভাবনা-চিন্তা করলে রোগ আরো বেড়ে যাবে, শান্ত হও. ভগবান তোমার মনে শান্তি দিন।...আমায় লেখাপড়া, কাজ কর্ম্ম শিখিয়ে মানুষ করে তুলেছ, আমার পথ আমি চিনে নিতে পারবো, রোগের যাতনার সঙ্গে আমার দুর্দ্দশার কথা ভেবে, নিজের ক্ষতি করো না।”

কিন্তু কনক সে কথায় কান না দিয়া, আবার টানিয়া টানিয়া কহিলেন—“একটা কথা মা, সংসারে এখন এঁরাই তোমার একমাত্র সহায় রইলেন, তা’ ছাড়া আর পা ফেলবার জায়গাটুকুও রইলো না; তোমার আশ্রয়, অবলম্বন, আত্মীয় আর অন্য কেউ দুনিয়ায় নেই, কিন্তু—”

—"থাক্ মা—তুমি বড্ড হাঁফিয়ে উঠ্‌ছো, এখন আর ও সব কথা কয়োনা, একটুখানি চুপ্ করে ঘুমোবার চেষ্টা কর।"

কনকমালা অল্পক্ষণ বিশ্রাম লইয়া পুনরায় ক্ষীণস্বরে কহিলেন—"না—না—শোন্, আর হয় তো বলা হবে না। সময় টুকু যে ক্রমেই সংক্ষেপ হ'য়ে আসছে তড়ি!"

বলিয়াই, সহসা যেন সবল হইয়া, আরম্ভ করিলেন—"নিজের অবস্থা বুঝে খুব সাবধানে চোলো—পদে পদে হুঁসিয়ার হ'য়ে থেকো। যে আশাকে মনে বেঁধে আমি, আর সকল দিক অগ্রাহ্য করে, কেবলই তোমাকে সুশিক্ষিত করে তুলছিলুম, বুদ্ধিমতী তুমি,—বুঝতে পারছো না! আমি বেঁচে থাকলে হয় তো বা তা সফল হতে পারতো, কিন্তু এখন তা দুরাশা হয়ে দাঁড়ালো।...তোমাকে এর বেশী খুলে বলবার দরকার নেই—বুঝতেই পারছো। দেখো মা—খুব সাবধান! দুর্ব্বুদ্ধিতে মজে যেন দুরাশায় ঝাঁপ দিয়ে নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডেকে এনো না।"

সহসা তড়িতার সর্ব্বাঙ্গের ভিতর দিয়া একটা প্রখর বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটিয়া তাহাকে একবার কাঁপাইয়া দিল। সে মুখে একটা কথাও বলিতে পারিল না, কেবল আকুল বেদনাময় ভিক্ষুকের চাহনি লইয়া, মাতার মুখের পানে চাহিয়া রহিল!...কনকের শ্রান্ত চোখ দুটি তখন অবসাদে বুজিয়া আসিয়াছে।

সেই দিন হইতেই রোগিনীর অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে যাইতে যাইতে তৃতীয় দিনের রাত্রে এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, তখন আর কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না তিনদিন পূর্ব্বের রোগিনীর ভবিষ্যদ্বাণী এত শীঘ্র এমন করিয়া ফলিয়া যাইবে!

তড়িতা আকুল হইয়া ছুটিয়া কমলবাসিনীকে ডাকিতে গেল, কিন্তু

তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গে সাহসী না হইয়া, নিরাশ হৃদয়ে, কম্পিত বক্ষে ফিরিয়া আসিল। তখন কনক শেষ বারের মত চোখ চাহিয়া—আর একবার গভীর স্নেহের স্বরে মেয়েকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"আর ছুটোছুটি করে ফল নেই তড়িতা! তুই—আমার কাছে ঘেঁসে বোস্।...সংসারে আপন পর ছুটো জিনিষের এইখানেই তফাৎ দেখা যায় না!"

তড়িতা কলের পুতুলের মত মাতৃ আজ্ঞা পালন করিল। কনক তাহার মাথার উপরে নিজের দুর্ব্বল হাতখানি ধীরে ধীরে রাখিয়া, এবার বেশ সুস্পষ্ট স্বরে একটী একটী করিয়া বলিলেন—"আবার শেষবারের মত বলে যাচ্ছি মা—আমার কথা সদাই মনে রাখিস। কখনও কোন দিন ভুলেও দুরাশায় মত্ত হয়ে অকূল-পাথারে ঝাঁপ দিয়ে নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডেকে আনিসনি। যেমন অবস্থার যেমন মানুষ তুই, তেমনি ভাবে থেকে—তেমনি ভাবে সংসারে চলা ফেরা করিস। জীবনের পরপারে গিয়ে, তোর দুর্দ্দশার পানে চেয়ে আর যেন আমাকে চোখের জল ফেলতে না হয়—"

যে ভাবে, যে স্বরে-কথাগুলি উচ্চারিত হইল, তাহাতে তড়িতার হৃদয়তল আলোড়িত করিয়া একটা মর্ম্মন্তুদ বেদনার বিরাট আবেগ কণ্ঠায় কণ্ঠায় ছাপাইয়া উঠিল, প্রবল উচ্ছ্বাসে, সে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া সহসা দৃঢ়স্বরে বলিয়া ফেলিল—"আমার শক্ত প্রতিজ্ঞার কথা শুনে নিশ্চিন্ত হও মা, তোমার শেষ আদেশ, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো। তোমার মেয়ে আমি, তোমার পরকালের পথে এক দণ্ডের জন্যেও অশান্তির কাঁটা ছড়িয়ে দেব না; আজ তোমার পাছুঁয়ে এই দিব্যি করলুম। বলেই তড়িতা মূমূর্ষু মাতার চরণ স্পর্শ করিল। তারপর সহসা মুখে আঁচল চাপিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কিন্তু রোগিনীর অসাড় দুর্ব্বল হস্ত মেয়ের মাথার উপর হইতে

খসিয়া পড়িল, চোক দুটী বুজিয়া আসিল।...তখন সেই মৃত্যুচ্ছায়া কবলিত ম্লান মুখখানির উপরে একটা অনাবিল শান্তির সুনিবিড় ছায়া বিরাজ করিতেছিল।......

* * *...ভোরের গাড়ীতে সস্ত্রীক ষ্টেশনে নামিয়া, নরেন্দ্র গৃহে যাইবার পথে যখন নলিনদের বাড়ীর কাছে আসিয়া পৌছিল, তখন তড়িতার মর্ম্মভেদী রোদনরোল উষার মন্থর গতিকে অলস করিয়া তুলিতেছিল।—এমনি সে বিলাপের তীব্র সাড়া!

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বরের মৃদুতীব্র সাড়ায় চকিত হইয়া, নরেন্দ্র স্ত্রী উমাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া, তাড়াতাড়ি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেই, উমার শান্ত কোমল অন্তর তড়িতার অসহ দুঃখে কাঁদিয়া উঠিল। সে তখনই বিপুল স্নেহে সদ্য মাতৃহারার শোকাহত দেহকে আপন সহানুভূতির ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া ডাকিল—"দিদি!"

———

২।১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কনকের মৃত্যু, একটা আকস্মিক ভূমিকম্পের মত কমলবাসিনীর সংসারটাকে নাড়াইয়া দিয়া গেলেও, তিনি তাহার গুরুত্ব তেমন করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, যেমন করিল তড়িতা। কমল তাহার এই দুঃসহ শোকে সান্ত্বনা দেওয়া দূরের কথা, গৃহস্থালীর তাবৎ ভারও তড়িতার উপরে চাপাইয়া, এবং হুকুম চালাইয়াই, অস্থির করিতে লাগিলেন, এবং নিজেই স্কুল লইয়া প্রবল উৎসাহে মাতিয়া রহিলেন। মা-হারা কন্যার বুকের ক্ষতে এতটুকু প্রলেপ দিতে চাহিলেন না।

তড়িতাও বিপুল প্রয়াসে আপনার হৃদয় ভার দমন করিয়া মাসীমার মন যোগাইবার জন্য উৎসাহের সহিত সকল কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে ছুটির দিনে নলিন গৃহে আসিলে, যখন তাহার দেখাশুনা এবং সেবা-যত্ন করিবার সকল ভারও গিয়া তাহারই ঘাড়ে চাপিয়া পড়িতে লাগিল, তখন এই গুরুভার অবিকল পাষাণস্তূপের মতই তাহার নিকট অত্যন্ত দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিল।

কিন্তু উপায়ান্তর ছিল না। অগত্যাই বাধ্য হইয়া তড়িতাকে অত্যন্ত সন্তর্পণে পা টিপিয়া পিছল পথে চলিতে হইত। যখনই গা একটু টলমল করিত, তখনই সে মৃত জননীর শেষ উপদেশ গুলিকে অবলম্বন-দণ্ডের মত সবলে আঁকড়াইয়া ধরিত। কিন্তু তেমনি করিয়া বছর দেড়েক কাটিতে না কাটিতে একদিনের একটা ঘটনায় তাহার সেই অবলম্বন-দণ্ডকে জানে কেমন করিয়া হঠাৎ ভাঙ্গিয়া একেবারে গুঁড়া হইয়া গেল।

নলিনের সর্ব্বশেষ পরীক্ষার মাস পাঁচ-ছয় পূর্ব্বে সহসা সাংঘাতিক পীড়িত হইয়া সে যখন বাড়ী আসিয়া পড়িল, তখন কমলবাসিনী হঠাৎ অত্যন্ত কোমল হইয়া, তড়িতার হাত ধরিয়া কাতর স্বরে কহিলেন—"ছাখ্ মা তড়ি, জগদীশ্বরের বিপরীত বিধান ছাখ্। আমরা সবাই কত আশা করে রয়েছি যে, এই ক'টা মাস পরেই নলিন পাশ ক'রে বেরিয়ে তাঁর কারবারটা দেখে শুনে হাতে নিয়ে বস্‌বে, না—তার মূলে তিনি একেবারে কুঠারাঘাত কর্‌লেন!...ভবিষ্যতের ভাবনায় আমি বড় আকুল হয়েছি মা! অনাদি বাবুর যা অবস্থা, তাতে করে তিনি যে দু-চার মাসের ভিতরে সম্পূর্ণ সেরে উঠে মধুপুর থেকে চলে আস্‌তে পার্‌বেন, সে ভরসাও নেই। এদিকে বাছারও প্রাণ নিয়ে টানাটানি!...এত কাল ধরে পরের হাতে প'ড়ে থেকে কারবারটার যে কি সর্ব্বনাশ হবে, তা ভাবতেও আমার গা কেঁপে ওঠে মা!"...

তড়িতা সান্ত্বনা দিয়া কহিল—"ভয় কি মাসি-মা, উনি শীগ্‌গির আবার সেরে উঠে এই বছরেই পাশ করে বেরোতে পারবেন।...এখনো এক্‌-জামিনের পাঁচ-ছমাস দেরী আছে।"

—"তাই বল মা, তোর বাক্য যেন সত্য হয়। আমি দিবারাত্রি ঈশ্বরের কাছে কেবল সেই প্রার্থনাই করছি! চোখের ওপর দেখছিস তো মা, চারদিকে আমার ঝঞ্ঝাট কত? একটা মুহূর্ত্তের জন্য নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ পাই না। ভাগ্যে তোকে পেয়েছিলুম তাই রক্ষা, নইলে যে কি করতুম, জানি না। এক মিনিট যে বাছার কাছে বস্‌বো এমন অবসর নেই। তুই-ই এখন আমার বল—বুদ্ধি—ভরসা—সব! দেখিস্ মা, বাছাকে আমার তোর হাতে সঁপে দিলুম। আমি গর্ভে ধরেছি মাত্র—কিন্তু ওর সকল ভার তোরই উপরে! দেখিস মা—ওর চিকিৎসা পত্র, সেবাশুশ্রূষার কোন রকম ত্রুটি না হয়!" তারপর নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তার পর হঠাৎ বলিয়া

ফেলিলেন—"আমার নলিনকে তোর করে সমর্পণ করে, আজ থেকে আমি নিশ্চিন্ত হলুম তড়িতা!"

এই কথা বলার পর, কমলবাসিনী প্রগাঢ় চিন্তার হাত এড়াইলেন বটে, কিন্তু তড়িতার যে বিপদ—যে সাংঘাতিক পরীক্ষার দিন আসিল, তাহাতে সে একবার নিভৃতে গিয়া ঐকান্তিক আকুলতা ভরে মৃতা জননীকে স্মরণ করিয়া, পুনঃ পুনঃ তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা না করিয়া থাকিতে পারিল না।

মাসখানেক কাটিয়া যাইবার পর, তড়িতার অক্লান্ত শুশ্রূষার ফলে নলিন যখন আরোগ্যের পথে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন কমলবাসিনী তড়িতাকে যে কোথায় রাখিবেন কেমন করিয়া আদর যত্ন করিবেন—খুঁজিয়া পাইলেন না। বুকভরা মাতৃস্নেহ নলিন ও তড়িতার মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করিয়া দিয়া, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন—"মা! তড়ি, তুই নলিনের জীবন দান ক'রে আজ আমায় যে ঋণে বেঁধে রাখ্‌লি, তোর সে ঋণ ইহজীবনে আমরা কেউ শোধ করতে পারবো না। আজ থেকে চিরদিনের জন্যই তোর কাছে আমরা বিক্রীত হয়ে রইলুম।...তোর স্নেহের স্পর্শে—"

সহসা তড়িতার সর্ব্বাঙ্গ একবার প্রবলভাবে কাঁপিয়া, মুখখানা এমন পাংশুবর্ণ ধারণ করিল যে, তাহা নজরে পড়িয়া কমলবাসিনী আর কথা শেষ করিতে পারিলেন না, সভয়ে প্রশ্ন করিলেন—"তোর কি অসুখ করেছে না কি?"

তড়িতার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সরমজড়িত কণ্ঠে জবাব করিল—"না"—

—"তবে?"

তড়িতা মাথা নীচু করিয়া জবাব দিল—"মাঝে মাঝে কেমন একটা

বেদনা—কিন্তু ও সব—কিছু না মাসি মা!......উঃ! কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে! ঘরের জানালাগুলো বন্ধ করে দিয়ে আসি—"

বলিতে বলিতে চঞ্চল পদে অন্যদিকে চলিয়া গেল। কমলবাসিনী মুহূর্ত্তকাল নীরবে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন,...একটা নিগূঢ় সমস্যার ক্রম-প্রসারিত জাল, তাঁহার অন্তরের চিন্তাশক্তিকে আবৃত করিয়া দিতেছিল।

* * * * *

সপ্তাহখানেক পরে বর্ষণক্লান্ত শ্রাবণের বিকালে, পশ্চিমাকাশ হইতে একটুখানি ম্লান রৌদ্র খোলা জানালার পথ বাহিয়া নলিনের ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া তাহার রোগ-শয্যার সহিত কোলাকুলি করিতেছিল।

নলিনের কিছু নিকটেই এক পাশে বসিয়া তড়িতা একখানা গৃহ-চিকিৎসার বই খুলিয়া নলিনের রোগের লক্ষণগুলো মিলাইয়া দেখিতেছিল। আর তার সামনেই, সদ্য রোগমুক্ত নলিন বিছানার উপরে তাকিয়া ঠেসান দিয়া, বাহিরে মাঠের দিকে বর্ষাজলবিধৌত শিরীষের পল্লবিত চাক্‌চিক্যের পানে চাহিয়া চাহিয়া আন্‌মনে কি চিন্তা করিতেছিল। হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই সে শিহরিয়া উঠিল!—

—ধব্‌ধবে বিছানায় প্রতিবিম্বিত রৌদ্রের স্নিগ্ধ আভাটুকু তড়িতার সুকোমল মসৃণ গণ্ডের উপর চিক্ চিক্ করিয়া তাহার অন্তরে এমন একটা বিহ্বলতা মাখাইয়া দিল যে, নলিন আর কিছুতেই আত্মদমন করিতে পারিল না, সহসা দুই হাতে তড়িতার হাত দুখানি টানিয়া ধরিয়া, গভীর আবেগভরে তাহার মুখের পানে চাহিয়া, ক্ষীণ—করুণ—কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল—"তড়ি!—তড়িতা!"

আচম্বিতে সর্পদষ্টের মত তড়িতা চম্‌কাইয়া শিহরিয়া উঠিল! বুকের ভিতরে ঘন ঘন তড়িৎ ছুটিয়া হৃৎপিণ্ড ধড়্‌ফড়্ করিতে লাগিল! সর্ব্বাঙ্গ

সবেগে কাঁপিয়া কর্ণমূল অবধি অত্যন্ত রাঙ্গা হইয়া গেল। বিদ্যুতের মতই চকিতে মুহূর্ত্তের জন্য মুখ তুলিয়া চাহিয়াই, চোখ দুটি নামাইয়া লইয়া সে হাত দুখানি টানিয়া লইবার জন্য ঈষৎ চেষ্টা করিল।

কিন্তু নলিন আরো একটু জোরে হাত দুখানি চাপিয়া ধরিয়া, ভিখারীর মত কাতরদৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া, মিনতির উচ্ছ্বাসে কহিল—"তড়ি, এ যাত্রা আমার প্রাণ দিলে তুমি, তোমার দেওয়া প্রাণ আজ তোমার হাতেই তুলে দিলুম।"

তখন বাহিরে, মাঠের ধারের রাস্তা হইতে বাতাসের উপর ভর করিয়া কাহার করুণ সঙ্গীতের বিহ্বল ঝঙ্কার ভাসিয়া আসিতেছিল—

"বঁধু কি আর কহিব আমি।
জনমে-জনমে জীবনে-মরণে প্রাণনাথ হ'য়ো তুমি!"

তড়িতার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সহসা যেন প্রলয়ের ভূকম্পনে কাঁপিয়া উঠিল! তার ডাগর আঁখির মধ্যে যেন সাগর উথলিয়া উঠিল! তাড়াতাড়ি হাত দুখানি সবলে টানিয়া লইয়া, চোখের পলকে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।—নলিন আবেগ-নত—স্তব্ধ!

কিন্তু সেই গতিভঙ্গিমা নলিনের কাণে যে অভিনব চির নূতন কথা বহু পুরাতন মন্ত্রের ফুৎকার দিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চিরন্তন অজ্ঞাত রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া ধরিল, শুধু তাহাতেই তাহার দারুণ আশঙ্কাজনক পীড়ার কবল হইতে মুক্তি পাইবার আর বিলম্ব ঘটিল না।

পুত্রের অতি দ্রুত স্বাস্থ্যোন্নতির প্রকৃত হেতু নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও, মায়ের মনে আর আনন্দের সীমা রহিল না। কমলবাসিনী আহ্লাদের উত্তেজনায় আবার একদিন তড়িতাকে আদরে ভরাইয়া দিয়া কহিলেন—"শুধু তোর গুণেই মা!...আমার সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী তুই—

শুধু তোর চেষ্টা, যত্ন আর ঐকান্তিক শুশ্রূষার জন্যই নলিন আমার এত শীগ্‌গির সেরে উঠে আবার কর্ম্মক্ষম হয়ে উঠতে পেরেছে।”

তড়িতা জবাব করিতে পারিল না, সঙ্কোচে মুস্‌ড়াইয়া এতটুকু হইয়া গেল। কমলবাসিনী মধুর হাসিয়া কহিতে লাগিলেন—“তোর মা আমার অনেক করে গেছে, তুইও জন্মের মত আমাদের ঋণে বেঁধে রাখ্‌লি। নলিনের এক্‌জামিনের এখনো তিন মাস সময় আছে,—এখন থেকে আবার চেষ্টা করলে এ বছরটা ব্যর্থ না হবারই সম্ভাবনা। ও যদি পাশ করে বেরিয়ে একবার নিজের কারবারটা বুঝে শুনে নিয়ে বস্‌তে পারে, তখন আর আমাদের কোন ভাবনাই থাক্‌বে না। যতই খরচ লাগুক, আমি তোকে মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করিয়ে লেডী ডাক্তার করে তুলবো।”

মুহূর্ত্তের জন্য তড়িতার মুখখানা পাংশুবর্ণ হইয়া গেল! কিন্তু পরক্ষণেই সাম্‌লাইয়া কহিল—“নাই বা হল এ বছরে একজামিন দেওয়া—”

কমলবাসিনী চঞ্চলকণ্ঠে বাধা দিয়া বলিলেন—“না—না, তা কি হয়! তা'হলে বড় ক্ষতি হবে আমাদের, আমি যে ওই ভাবনাতেই এতদিন আকুল হয়ে পড়েছিলুম। এ বছরেই ওকে পাশ করে বেরোতে হবে।”

তড়িতা একটা উদ্গত দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া লইয়া হতাশ ভাবে কহিল—“তাই যদি হয়, তা'হলে ঘরে থেকেই উনি এক্‌জামিনের জন্যে তোয়ের হোন, যে রকম হ'য়ে রোগটা বেড়ে উঠেছিল, তাতে আমার মনে হয়—আরো দু-এক মাস শিবপুরে গিয়ে কাজ নেই। এখনো যে ভাল করে কাহিল সারে নি! সেখানে আপনার জন কে আছে যে, দেখা-শুনো—যত্ন-আত্তি করবে?”

তড়িতার কণ্ঠস্বর সজল হইয়া শেষের কথাগুলি ভারি হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটিও ছল ছল করিয়া আসিতেই সে যে অতি কষ্টে তাহা দমন করিয়া লইল, তাহাও কমলবাসিনীর দৃষ্টি এড়াইল না। মুহূর্ত্তকাল

আশ্চর্য্যভাবে তড়িতার মুখের পানে চাহিয়া, পরক্ষণেই তাহাকে সাদরে বক্ষে ধারণ করিলেন এবং সহসা মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন—"শুধু সেখানে কেন, তোমার কাছে না থাকলে, এমন প্রাণ-ঢালা সেবাযত্ন পৃথিবীতে আর কার কাছে ও পাবে মা ? তাই হোক্, তুমি ওর প্রাণ...দেহ,—তোমার কথা ঠেলবো না। নলিনের এখন শিবপুরে গিয়ে কাজ নেই, আরো মাস-খানেক ঘরে থেকেই একজামিনের জন্য তোয়ের হোক। এ বছরটা ব্যর্থ করা হবে না—ওকে পাশ করে বেরোতেই হবে,...কিন্তু তুই এ দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিস্ মা !"

কমলবাসিনী তড়িতার চিবুক ধরিয়া স্নেহভরে নাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু সেই মাসখানেক পূরাপূরি না কাটিতেই—তড়িতার ভাগ্যদোষে তাঁহার সে ভাব সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া, তাঁহাকে একেবারে প্রাণশূন্য, কঠোর পাষাণস্তূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া গেল।...

সন্ধ্যার পূর্ব্বে কমলবাসিনী তাঁহার স্কুলের কার্য্যে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, এবং তড়িতাও নীচের রন্ধনশালায় নিজের দৈনন্দিন রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। নলিন একাকী তাহার নির্জ্জন শয়নকক্ষে টেবিলের সম্মুখে বসিয়া কেরোসিনের আলোয় নিবিষ্ট মনে পড়িতেছিল। রাত্রি নয়টার সময় রাত্রের খাবার প্রস্তুত শেষ করিয়া উপরে আসিয়া, তড়িতা দ্বার সম্মুখে ক্ষণকাল নিঃশব্দে দাঁড়াইল, তারপরে তেমনি নিঃশব্দে পিছন হইতে পা টিপিয়া গিয়া দু'হাতে নলিনের চোখ টিপিয়া ধরিল।

"তবেরে চোর !"—বলিয়াই, নলিন খপ্ করিয়া পিছন ফিরিয়া তাহার হাত দু'খানি ধরিয়া বুকের উপর টানিয়া লইতে গেল। কিন্তু তড়িতা বাধা দিয়া তৎক্ষণাৎ হাত ছাড়াইয়া লইল, এবং তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর হইতে নলিনের পড়ার বইগুলি সরাইয়া রাখিতে রাখিতে কৃত্রিম ক্রোধের ঝঙ্কার তুলিয়া বলিয়া উঠিল—"বলি, মনে ঠাউরেছ কি বল দেখি ? এই সন্ধ্যা-

বেলাতে বলছিলেন—মাথা টিপ্ টিপ্ করছে—আবার এত রাত অবধি কেরো-সিনের আলোর সামনে বসে রয়েছ! দু'দিন অমন শক্ত ব্যামো থেকে ভাল করে সেরে উঠতে না উঠতে, দিনরাত এমন হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে কি শেষকালে আমার মাথা খাবে না কি?"

নলিন মুগ্ধভাবে হাসিয়া জবাব করিল—"এমন মৃত-সঞ্জীবনী কবচ যার বুকে ঝুল্ছে, সে কি মরে?"

ধাঁ করিয়া নলিনের গালে একটি মৃদু ঠোনা মারিয়া তড়িতা চোখ রাঙাইয়া বলিল—"চোপ্, কথার শ্রী দেখ! না না—ওসব চল্বে না বলে দিচ্ছি, যা হয় হবে। দিনে বরং যা হয় পড়ো, রাত্রে আর তুমি বই ছুঁতে পাবে না, কিছুতেই না।"......

তখন দু'জনের কেহই টের পায় নাই যে,—বাহির হইতে গৃহে ফিরিয়া, বারাণ্ডা দিয়া নিজের ঘরে যাইতে, কমলবাসিনী সেই ব্যাপার দেখিয়া, দোরের আড়ালে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন।

সহসা, মৃদু পদশব্দে উভয়েই চম্কাইয়া, সভয়ে দোরের দিকে চাহিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। নলিন কি বলিতে যাইতে-ছিল, অকস্মাৎ কমলবাসিনীর কঠোর কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল—"বলি—হাঁ, রে—তড়ি! আজ কি তুই মরেছিস্ নাকি! ন'টা কখন বেজে গেছে—খাবার-দাবার দেওয়ার নাম-গন্ধ নেই!...কি ব্যাপার?"

তড়িতা সভয়ে থর্ থর্ করিয়া, কম্পিতস্বরে জবাব করিল—"যাচ্ছি—মাসি-মা!"

কিন্তু তাহার প্রত্যুত্তরে বাঘের গর্জ্জনের মত, কেবলমাত্র ঈষৎ ঝঙ্কার আসিল—"হুম্!"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

দুপুরের সূর্য্য পশ্চিমাকাশে হেলিয়া পড়িলেও বসন্তের প্রারম্ভে—তখনও পর্য্যন্ত রোদে কাঠ ফাটিতেছিল। খস্‌খসের-টাটিতে ঘেরা মধুপুরের ক্ষুদ্র বাংলার এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে সোফায় হেলান দিয়া, বিজলী হস্তস্থিত 'সীতার বনবাস' বইখানাকে অবজ্ঞাভরে ছুড়িয়া দিয়া মনোরঞ্জনকে কহিল—"এ ছাই-ভস্ম পড়ে হবে কি! বাংলায় কি পড়বার মত বই একখানাও আছে,—সাধে আমি ওগুলো ছুঁতে চাই না?"

মনোরঞ্জন মধুর হাসিয়া সায় দিয়া কহিল—"আপনার মতের সঙ্গে আমার মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রবীণ যাঁরা—দেশের মান্য-গণ্য সম্প্রদায়, তাঁরা ওগুলোকে গ্রেটেষ্ট্ এপিক্ (Greatest Epic) বলে গৌরব করেন, আর পোড়া দেশের অবস্থাটাও এম্নি যে, ওগুলো না পড়লে আবার এক্‌জামিন দেওয়া চলে না!"

—"দরকার কি তেমন এক্‌জামিন দেবার?" বলিয়া বিজলী [illegible]ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিল—"লেখাপড়া শেখা জ্ঞানলাভের জন্য—আত্মোন্নতির জন্য। এতে তা কতটুকু হতে পারে, বলুন তো? যে রামচন্দ্র বিনা প্রমাণে, বিনা বিচারে অমন প্রেমময়ী পত্নীকে বনে পাঠাতে পারে, তার উপরে কিনা দেবত্বের আরোপ করে আদর্শ পতি বলে প্রচার করছে! আর যে হতভাগিনী নারী অশেষ প্রকারে নির্য্যাতিত হয়ে, বনবাসে পরিত্যক্ত হ'ল, সেই কিনা—তার সেই দুর্ব্বৃত্ত স্বামীর প্রতি অধিকতর অনুরাগিণী হয়ে

বল্‌ছে—জন্মজন্মান্তরে যেন—রামচন্দ্রকে পতি-রূপে পাই ! ওঃ—কি জঘন্য, ন্যাষ্টি (Nasty) কল্পনা !”

...সেই গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লাগার পর, মধুপুরে মাস কতক থাকিয়া অনাদিনাথের শরীর সারিলেও, একটা বড় রকমের কাজ পাইবার প্রত্যাশায়—যাই যাই করিয়াও—কলিকাতায় ফিরিতে তাঁহার বিলম্ব হইতেছিল। মধুপুরে অনাদিবাবুর পরিচিত বন্ধু বান্ধবের সংখ্যাও বড় কম ছিল না, এবং তাঁহাদেরই চেষ্টায়, মেয়ের জন্য এই বি, এ, ফেল-করা গৃহশিক্ষকটিকে পাইয়া তিনি বিজলীর লেখাপড়ার ভার তাহার উপরে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নূতন কাজের চেষ্টায় ফিরিতেছিলেন। কলিকাতা যাইবার কথাটা আজকাল এই পিতাপুত্রী দুজনকার মন হইতেই সরিয়া গিয়াছিল।

এক এক জন মানুষ নিজের বাহিরের আবরণটুকুকে এম্‌নি সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতে জানে যে, সহস্রের ভিতরে মিশিয়া থাকিলেও, তাহাকেই সর্ব্বাগ্রে লোকের চোখে পড়ে। আর, একবার চোখে পড়লেই সে মূর্ত্তি মনের ভিতরে অঙ্কিত হইয়া যায়। বিজলীর গৃহশিক্ষক মনোরঞ্জনবাবুটী স্বপুরুষ না হইলেও বেশভূষা, চাল-চলন, আদব-কায়দা এবং কথাবার্ত্তায় সকলের নিকটেই নিজের নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়া তুলিতেন। এই ফিট্‌ফাট এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি মাষ্টারের সাহচর্য্যে দিনগুলা এমনি বিরামের ও শান্তির ভিতর দিয়া কাটিয়া চলিতেছিল যে, বিজলীলতারও কলিকাতার আকর্ষণ ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতেছিল।

মনোরঞ্জনের সঠিক পরিচয় কেহই জানিত না। সে বছরখানেক পূর্ব্বে একখানা অজ্ঞাতনামা মাসিকপত্রের গ্রাহক সংগ্রহ করিতে আসিয়া, এখানে এমনভাবে সকলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল যে, ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বকর্ম্ম বিশারদ সভ্যগণ তাহাকে তাঁহাদের প্রিয়পাত্র করিয়া লইতে বাকী রাখেন নাই। তাঁহাদেরই চেষ্টায় বিজলীর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়া, মনোরঞ্জন অল্প

কালের ভিতরেই ছাত্রীটির সহিত এমন ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া লইয়াছিল যে, অনাদিনাথের অজ্ঞাতে তাঁহার বন্ধুবর্গ মনোরঞ্জনের অদূর ভবিষ্যতের একটা অত্যুজ্জ্বল চিত্র কল্পনা করিয়া, তাহার আশ্চর্য্য শক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

বিজলীকে আরও একটু উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে মনোরঞ্জন সায় দিয়া বলিল—"শতবার আমিও আপনার কথায় ভিটো দিই। এবং যে কোন উচ্চশিক্ষিত ন্যায়বান যুবক তা দিতে বাধ্য। তাঁরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন যে,—স্ত্রী পুরুষের যে সমান স্বাধীন অধিকার প্রচার করবার জন্য আমরা প্রাণপাত চেষ্টা করছি, তার মূলচ্ছেদ করবার অভিপ্রায়েই এই প্রকার সীতা-চরিত্রের কল্পনা করা হয়েছে।"

কথার উপর জোর দিয়া বিজলী বলিল—"শুধু তাই নয়, সমগ্র নারী-জাতির আত্মসম্মানের উপরে আঘাত দেবার চেষ্টা—ওঃ অসহ্য! এরা স্ত্রী-জাতিকে কি মনে করে, আমি কেবল তাই ভাবি! বর্ব্বরতার যুগে যে সব দেশে দাসপ্রথার প্রচলন ছিল, তারাও নারীকে এতখানি হীনতার চোখে দেখতো না। তুচ্ছ ক্রীতদাসী হয়ে অনেকে অনেক বড় বড় সংসারে গৃহ-কর্ত্রীরূপে ক্ষমতা পরিচালন করে গেছে, এমন দৃষ্টান্ত, গল্প উপন্যাসে আমি ভূরি ভূরি পেয়েছি। কেবল এই পোড়া বাংলা দেশেই যত নীচতা আর অত্যাচার!...ছেলেবেলা থেকেই কচি কচি মেয়েগুলিকে এই সব [illegible] পড়িয়ে এমন করে মাথা খেয়ে দেয় যে, আমাদের নিজের স্বাধীন শক্তি, স্বাধীন অধিকার মাথা তুলে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে ভেঙ্গে পড়ে।...ছিঃ ছিঃ! কি ঘৃণার কথা! নারী কি কেবল স্বামীর দাসীবৃত্তি করতেই জন্মগ্রহণ করেছে!"

উত্তেজনায় বিজলীর দেহ কাঁপিয়া উঠিল, তার দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া যেন আগুন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতে লাগিল! মনোরঞ্জন একটা সরস কটাক্ষ

নিক্ষেপ করিয়া দৃঢ় কণ্ঠে সমর্থন করিল—"কখনো নয়—কখনো নয়। নারী হৃদয়ে যে শক্তি, যে তেজ, যে মহত্ত্ব, যে প্রেম আছে, পুরুষের মধ্যে তার কণামাত্রও নাই। এই সত্যের উপাসক বলেই সমগ্র পাশ্চাত্য জাতির আজ এত উন্নতি!"

—"আপনার কথা মাথা পেতে নিই। দেখুন তো তাদের সাহিত্য কেমন চমৎকার! 'এনক-আর্ডেন' বইখানা তো আপনিই আমাকে পড়িয়েছেন, আচ্ছা বলুন তো, 'এ্যানি, যদি সীতার মত, কেবলমাত্র 'এনকের' উপরেই আত্মসমর্পণ করে পড়ে থাকতো, তা'হলে অমন চমৎকার কাব্য,—কাব্যে অমন উঁচুদরের রোমান্স সৃষ্টি হ'ত কি? যতদিন এই হতভাগ্য বাংলা দেশের লোকেরা পুরুষের সঙ্গে নারীর সমান অধিকার না দেবে, ততদিন এ দেশের—এ জাতির উন্নতি—"

—"হবে না—হবে না—হবে না।" বলিয়া মনোরঞ্জন বিজলীর কথাটার মনের মত উপসংহার করিয়া দিয়া সোৎসাহে টেবিল চাপড়াইয়া কহিল—"এই কথা প্রচার করতে গিয়েই তো আমি গাঁ থেকে তাড়িত হয়েছি! কিন্তু তাতেও পেছ পা হ'য়ে থাকিনি!—এই ধ্রুব সত্য প্রচার করাই এক্ষণে আমার জীবনের একমাত্র ব্রত! প্রাণপাত করেও এ সত্য আমি প্রতিষ্ঠা করবোই—"

প্রশংসমান দৃষ্টিতে মনোরঞ্জনের মুখের দিকে চাহিয়া বিজলী উৎসাহ-ভরে কহিল—"ধন্যবাদ, সহস্র ধন্যবাদ আপনাকে, আমার হৃদয়ের ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতা এবং সহানুভূতি গ্রহণ করুন।"

মধুর হাসিয়া মনোরঞ্জন বলিল—"এ পুরস্কারের অযোগ্য আমি, কারণ সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও এখনো কিছুই করে উঠ্‌তে পারিনি। আমাদের সমাজ এ বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রসর হ'লেও এখনো দুর্ব্বল, তাই আমার সমস্ত উদ্যম নষ্ট হ'য়ে চলেছে। প্রত্যেক কাজে, পদে পদে নিষ্ফলতা পেয়ে আমি

আজকাল দেশ-বিদেশ পর্য্যটন করে, কেবল একজন ... সঙ্গিনী অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছি, যে আমার অন্তরের যাতনায় সং...তির অমিয় ছড়িয়ে দেবে। যদি এমন একজন সঙ্গিনী পাই, যে পতিত ...জাতির উদ্ধারের জন্য আমারই মত সর্ব্বস্ব পণ করে চিরজীবন আমারই পাশে দাঁড়িয়ে, আমাকে এই মহাকাজে উৎসাহ দিতে পারে, তা'হলে অচির ভবিষ্যতে দেখতে পাবেন যে, সমগ্র বিশ্ব, বিস্ময়-পুলকে আমাদের দু'টি প্রাণীর নাম ও গৌরব-গাথা গেয়ে নিজে ধন্য হবে আর আমাদেরকেও ধন্য করবে।"

টেবিলের উপরে সজোর সশব্দ মুষ্ট্যাঘাতের সহিত মনোরঞ্জন এমন ভাবে তাহার বক্তব্য শেষ করিল যে, তাহার কথায়, কণ্ঠস্বরে, চাহনিতে, ভঙ্গীতে, একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব উত্তেজনার মদিরা-স্রোত বিজলীর শিরা-ধমনীতে প্রবাহিত হইয়া তাহার কচি মগজটাকে ভয়ানক উত্তেজিত করিয়া তুলিল।...আপনার অস্থির বিহ্বলভাবে বিভোর হইয়া অলস ভঙ্গীমায় আকুল লালসার সুরে বলিয়া উঠিল—"নিরাশ হবেন না মনোরঞ্জন বাবু! আপনার এই মহৎ ব্রতের সহায় হবার সঙ্গিনীর অভাব হবে না। যদি আর কেউ না হয়, তা'হলে—তা'হলে—অন্ততঃ আমাকে আপনার সহচারিণী চির-সঙ্গিনী বলে জানবেন।"

মনোরঞ্জনের সারা মুখখানা অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। প্রেম ... কৃতজ্ঞতাময় প্রদীপ্ত চোখে চাহিয়া, আবেগ ভরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ...ষণ করিয়া কহিল—"ধন্য ধন্য আপনি, জগতে শ্রেষ্ঠতম নারী রত্ন! ধন্য আপনার শিক্ষা-দীক্ষা, উদারতা—ধন্য হৃদয়ের বল! এমন জীবন-সঙ্গিনী লাভ করে আমি সম্রাটের গৌরবে মণ্ডিত হলুম!...কি দিয়ে তার প্রতিদান করবো!" বলিয়াই, খপ্ করিয়া তাহার হাত দু'খানি ধরিয়া আবৃত্তি করিল—

"নাইতো আমার কোন সাধনা,
ঝরলে তোমার কৃপার কণা,

নিমেষে কি ফুটবেনা ফুল,
চকিতে ফল ফল্‌বেনা—"

সহসা দরজায় গাড়ীর শব্দে উভয়েই চমকাইয়া নীরব হইল। বিজলীলতা চকিতে ছুটিয়া গিয়া জানালা খুলিয়াই, ঈষৎ আশঙ্কার সুরে বলিয়া উঠিল—"কি সর্ব্বনাশ! বেলা যে একেবারে পড়ে গেছে, কিচ্ছু টের পাইনি তো!... বাবা ফিরে এলেন!" বলিতে বলিতে ছুটিয়া গিয়া পরদা ঠেলিয়া দোর খুলিয়া দাঁড়াইল। মনোরঞ্জন অত্যন্ত জড়সড় হইয়া পড়িয়াছিল, সাম্‌লাইতে না সাম্‌লাইতে, সহসা অনাদিবাবু কক্ষে প্রবেশ করিয়াই বিজলীকে কহিলেন—"আজ যে এখনো পড়ছিস্ মা?"

বিজলী জবাব করিতে না করিতে মনোরঞ্জন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—"সীতার বনবাসখানা আজ শেষ করে দেওয়া গেল।"

বলিয়াই ত্রস্তভাবে বিদায় লইয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। অনাদিনাথ একখানা আরাম-চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—"বড় সুখবর মা, নলিন ফাইনাল একজামিনে পাশ হয়েছে।"

বিজলী পিতার বস্ত্র-পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়া দিতে দিতে বলিল—"শুনে সুখী হলুম, ভদ্রলোক বিস্তর পরিশ্রম করেছেন।"

কণ্ঠস্বর ও কথার ভঙ্গিটুকু যেন কেমন-কেমন শুনাইল। কিন্তু তাহা গ্রাহ্য না করিয়া অনাদিনাথ বলিয়া গেলেন—"হ্যাঁ মা, বেচারা বড় খেটেছে, তাই জগদীশ্বর পুরস্কৃত করেছেন। নইলে, যে রকম কঠিন ব্যামো থেকে বেঁচে উঠেছে, তাতে কারুর আশা ছিল না যে, এ বছর একজামিন দিতে পারবে। আর আমারও সে সময় এমনি বাড়াবাড়ি হয়ে উঠেছিল যে, একবার গিয়েও তাকে দেখে আসতে পারিনি।"

—"সে জন্য আক্ষেপ কেন বাবা, সে তো এখন সেরে উঠেছে—পাশ করে বেরিয়েছে?"

—"হ্যাঁ, আর দুঃখ নাই, এখন আনন্দের সময়। এবার—একেবারেই সেখানে গিয়ে—"

সহসা বিজলী অত্যন্ত চমকাইয়া এমন জিজ্ঞাসুভাবে চাহিল যে, অনাদিনাথ থামিয়া গিয়া, অনেকটুকু আশ্চর্য্যভাবেই কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর তখনই মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"ও—তোকে যে কিছুই বলা হয় নি, এখনো। তা আর বলাবলির দরকার নেই—এই নে, কমলবাসিনীর চিঠিখানা পড়ে দেখ।" বলিয়া, পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া, বিজলীর হাতে দিয়া পুনরায় কহিলেন—"তাঁর নিতান্ত ইচ্ছা যে চাতরায় তাঁর নিজের বাড়ীতেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হয়, সেখানে তিনি এই বিবাহের সকল আয়োজনই ঠিক করে রেখেছেন। আমরাও পরশু যাব বলে এইমাত্র টেলিগ্রাম্ করে দিলুম।"

কিন্তু বিজলী তো সে চিঠি পড়িলই না, অধিকন্তু এমন বিরস মুখে এক-দৃষ্টে মাটীর দিকে চাহিয়া পুতুলের মত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল যে, অনাদিনাথ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরে চিঠি পড়্‌লি না,—অমন করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?"

বিজলী মুখ না তুলিয়াই আস্তে আস্তে বলিল—"আমাকে মাপ্ কর বাবা!"

অনাদিনাথের মুখে কথা সরিল না, গভীর বিস্ময়ভরে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। বিজলীলতা দৃঢ়ভাবে, কম্পিত কণ্ঠে কহিল—"নলিনবাবুকে বিবাহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

অনাদিনাথ একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! তাঁহার মুখ দিয়া আপনা আপনি বাহির হইয়া গেল—"অ—স—ম্ভব?"......তারপর অনুতাপক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলিলেন—"কিন্তু কেন অসম্ভব মা?"

বিজলী যথেষ্ট চেষ্টায় লজ্জা দমন করিয়া নতমুখে, অথচ দৃঢ়কণ্ঠে কহিল —"আমি অন্যের কাছে বাক্যবদ্ধ !"

সহসা অনাদিনাথের দেহের ভিতর দিয়া যেন একটা প্রচণ্ড অনলের শিখা দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া গেল, সর্ব্বাঙ্গ উত্তপ্ত হইয়া চোখ দুইটা যেন ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিল ! জ্বালাময় বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া কহিলেন—"অ্যাঁ—অন্যের কাছে তুমি বাক্যবদ্ধ ?...আর আমি বাক্য-বদ্ধ নয় ? তাও কি শুধু পৃথিবীর লোকের কাছে ? যে মহৎচরিত্র উদারহৃদয় বন্ধুর কাছে আমি এই বিপুল ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, সম্মান প্রতিপত্তির জন্য ঋণী, তাঁর অন্তিম-শয্যায় বাক্যদান করে স্বেচ্ছায় যে বন্ধন গলায় পরেছি, তার কঠিনতা—তার পবিত্রতা—তার নিবিড়তা যে পৃথিবীর লক্ষ লোকের লক্ষ বাক্যদানের উপরে ! সেই প্রতিজ্ঞা তুমি এমন করে ভেঙ্গে দিতে চাও ? সেই অশরীরী আত্মা যে প্রতি পলে পলে এখনো আমার চোখের সুমুখে দাঁড়িয়ে সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে !—কি জবাব দিয়ে আজ তাকে ফিরিয়ে দেব ?"

অনাদিনাথ একদৃষ্টে শূন্যপানে চাহিয়া রহিলেন। বিজলী একবার মাত্র চোখ তুলিয়াই, সভয়ে নত হইয়া ক্ষুব্ধস্বরে কহিল—"কিন্তু কেন এমন কাজ করলে বাবা ?"

—"কেন করলুম ? হায়রে হৃদয়হীন অকৃতজ্ঞ সন্তান ! এই বাক্শক্তি অর্জ্জন করেছিস্ কার কাছ থেকে ? দু'বছরের মা-হারা অশক্ত নিরাশ্রয় ছিলি,—কার বুকের উপর বসে পলে পলে—বিন্দু বিন্দু স্নেহধারা শোষণ করে নিজের দেহ আজ এমন পরিপুষ্ট করে তুলেছিস্ ?" তারপর অতিরিক্ত হতাশ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"হা—রে—অভাগা সংসার !—তোর সুখ কোথায় ?" বলিতে বলিতে পুনরায় শূন্যপানে চাহিয়া স্বর্গগতা স্ত্রীর উদ্দেশে সহসা আবেগাকুল ভগ্নকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"আজ কোথায়—কোথায়

তুমি! অন্তিম নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে যে গুরুভার আমার ঘাড়ে চাপিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেছ, সংসারের সহস্র ঝঞ্ঝার ভিতরেও অটলভাবে সে ভার বহন করে আজ তোমারই দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি। আজ এ দেহ ভঙ্গ—হৃদয় শিথিল, আর শক্তি নেই—আর উৎসাহ নেই। এখন যেখানে যেভাবে থাক, একবার করুণ কটাক্ষে চেয়ে আমাকে মুক্তি দাও দেবি!"...

অনাদিনাথ আরামচৌকির উপরেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন! বিজলী পিতাকে আর কখনো এরূপ কাতর ও উদ্‌ভ্রান্ত হইতে দেখে নাই, সে তাঁহার মুখের উপর শঙ্কাকুল বিস্মিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। সহসা তাহার মনে পড়িল—চিকিৎসকের কথা! মধুপুরে আসিবার সময়ে তাঁহারা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, অনাদিনাথের এই হৃদ্‌রোগে হঠাৎ কোন কিছু মানসিক আঘাত পাইলেই মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা আছে!

বিজলীর পদতলে পৃথিবী যেন কাঁপিয়া উঠিল! চোখের সম্মুখে সমস্ত বিশ্ব টলমল করিয়া দুলিতে লাগিল! সেই নিবিড় অন্ধ-তমসার ভিতরে কেবলমাত্র ফুটিয়া উঠিল—অনাদিনাথের বেদনাক্লিষ্ট নিরাশ মুখখানি, রাহুগ্রস্ত পাণ্ডুর শশধরের মত মলিন—নিভ-নিভ হইয়া! বিজলী আর সহিতে পারিল না, ব্যথিত কণ্ঠে উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া উঠিল—"বাবা—বাবা—অকৃতজ্ঞ, পাষাণী আমি!—মার্জ্জনা কর আমাকে। আমার জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ, আশা-ভরসা—সব আজ তোমার চরণে অঞ্জলি দিলুম।...বাবা—বাবা—" বলিতে বলিতে অনাদিনাথের পায়ের তলায় ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া, তাঁহার পা'দুখানি কোলে তুলিয়া লইয়া চোখের জল ঢালিতে লাগিল।...

...সারারাত্রি ডাক্তারের অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে ভোরের বেলায় অনাদিনাথের সংজ্ঞা ফিরিলে, বিজলী তাঁহার গলা জড়াইয়া বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—"বাবা, আমি সব গোছ-গাছ—বাঁধা-ছাঁদা করবার হুকুম

দিয়েছি, কিন্তু তুমি এমন করে পড়ে থাকলে গাড়ী রিজার্ভ করে আসবে কে? আজকের দিনটি ছাড়া আর যে সময় নেই?"

অনাদিনাথ নীরবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। বিজলীলতা অসীম চেষ্টায় বুকের ভিতরে একটা বিষম আঘাত সাম্‌লাইয়া লইল, তারপরে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিল—"অমন করে চাইছো কেন, চিঠির কথা কি ভুলে গেছ বাবা? কাল যে চাত্‌রায় যাবার দিন?"

অনাদিনাথের দুই চক্ষু জলে ছাপাইয়া উঠিল। মেয়ের মুখখানি বুকের উপরে ধীরে ধীরে চাপিয়া ধরিয়া গদগদ স্বরে কহিলেন—"মা—মা—মা আমার—"

—"বাবা—বাবা—"

চোখের জলে চোখের জল মিশিল, ঘুমন্ত শিশুর মত বিজলীলতা পিতার বক্ষে মুখ ঢাকিয়া নীরবে পড়িয়া রহিল।

———

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

তড়িতার দুঃখের দিনগুলি যেরূপ কঠোরভাবে কাটিতে সুরু হইয়াছিল, তাহা সে মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘনের বিধিদত্ত ন্যায্য প্রাপ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই বটে, কিন্তু অচিরকালের ভিতরে তাহা যখন সহসা একদিন, মেঘাবৃত আষাঢ়ের নিশ্বাস-রোধকারী দুর্দ্দিনের মত, মাথার উপরে একটা বিরাট পাষাণস্তূপের জমাট ভারে চাপিয়া পড়িল, তখন সে আর সেখানে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিল না!

কনকের মৃত্যুর পর হইতে কমলের সংসারের সকল ভার তাহার উপরে চাপিয়া পড়িলেও, মাসীমার স্কুলসংক্রান্ত কোন কার্য্যই তাহাকে করিতে হইত না। কিন্তু নলিন-সংক্রান্ত ঘটনার পর হইতে শুধু যে সেই স্কুলের নিম্নশ্রেণীগুলিতে পড়াইয়া আসাই তাহার নিত্যকার্য্যের ভিতরে ধার্য্য হইয়া গিয়াছিল এমন নয়, সেখানকার যাবতীয় খুঁটিনাটির কাজটি পর্য্যন্ত তাহাকে এমনভাবে সম্পন্ন করিতে হইত যে, সে সকল সারিয়া ঘরে ফিরিতে একদিনও দিনের আলো দেখিবার সময় মিলিত না।

তেমনি করিয়া চলিতে চলিতে, হঠাৎ একদিন রাত্রি দণ্ডখানেকের পরে ঘরে ফিরিয়া, নিজের কক্ষে যাইতে, তড়িতা সহসা কমলের ঘরে তরল হাস্যধ্বনির সহিত অপরিচিত কণ্ঠে নিজের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া জড়সড় হইয়া দাঁড়াইল। ইদানীং কমলবাসিনীর স্নেহশূন্য নীরস কণ্ঠের ব্যবহারের ভিতরে দুই চারিটা অস্পষ্ট ইঙ্গিতের আভাসে যে কালো মেঘ-

খানা তাহার হৃদয়াকাশে ধূসর ছায়া বিস্তার করিতে করিতেও মিলাইয়া যাইত, তাহাই সহসা নিবিড় ছায়া ফেলিয়া জমাট হইয়া উঠিতে লাগিল। তড়িতা একটুখানি কান পাতিয়া না শুনিয়া কিছুতেই চলিয়া যাইতে পারিল না।—

কমলের ঘরের ভিতর বসিয়া বিজলীলতা তাঁহাকে উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কই মা, কোথায় তোমার সেই—তড়ি-ফড়ি না কি—কোথায় সে? সন্ধ্যা তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, এখনো পর্য্যন্ত ইস্কুলে সে করছে কি?...আগে যদি তার খবর আমাকে শোনাতে, তাহ'লে এতদিনে অন্ততঃ চিঠিপত্র লিখেও, তাকে আমার মনের মত করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করতে পারতুম...কি বল বাবা?"

অনাদিনাথ হাসিয়া বলিলেন—"তা, এখনো তো সে সময় যায়নি, আজ রাত থেকেই সুরু করে দাওনা?...তোমার সংসর্গে এলে দু'বছরের শিক্ষা তার যে দু'দিনেই হয়ে যাবে, সে বিশ্বাস আমার যথেষ্ট আছে।"

বিজলী অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে কহিল—"তবু আমাকে আগে জানানো তোমাদের উচিত ছিল বাপু!"

কমলবাসিনী অম্লান কণ্ঠে বলিয়া গেলেন—"সামান্য দাসী-বাঁদীর কথা আর তোমাকে কি জানাব মা?...ও কি আর একটা ধর্ত্তব্যের মধ্যে?"

—"তবে যে শুনলুম তার মা-ও—"

—"হ্যাঁ—তার মা আমার ইস্কুলেই লোয়ার ক্লাসে টিচারি করতো, আর বাড়ীতে রান্না-বান্না সব কাজই করতো।"

—"ওঃ—রাঁধুনী, তারই মেয়ে বুঝি?"

—"তা নয় তো আবার কি? অত্যন্ত বদ্, আর এমনি নোংরা, কুঁড়ে আর—আর এমনি—"

বিজলী অতিরিক্ত তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীমায় নাসিকা কুঞ্চিত করিল, তারপর

প্রবল বিজ্ঞের মত বলিল—"ওসব ছোটলোকের দশাই ওই, ওদের মনের মত করে গড়ে তুলতে না পারলে অত্যন্ত অশান্তির সৃষ্টি করে। ঠিক কুকুরের জাত, একটু আদর দেখালেই অমনি যে মাথার উপর চড়ে বস্‌তে চায়।...নইলে ঘুটে কুড়োনীর মেয়ে হ'য়ে রাজ্যপাটের আশায় মেতে উঠেছিল—" বলিতে বলিতে তরল হাস্যে ঘর ভরাইয়া দিল। কমলবাসিনীও তাহাতে যোগ না দিয়া পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার হাসিটুকু কিছুতেই বিজলীর দম্ভমাখা হাসির সঙ্গে থাপ খাইল না, বরং যেন একটু বেস্থরা ঠেকিল। তাহা দেখিয়া, সে প্রসঙ্গ চাপা দিবার অভিপ্রায়ে অনাদিনাথ বলিয়া উঠিলেন—"যতক্ষণ পর্য্যন্ত নলিন নির্ব্বিঘ্নে বাড়ীতে এসে না পড়্‌ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার মনে এ হাস্যামোদ পূর্ণতা লাভ করতে পারছে না। সেই বিগত আত্মা বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধার প্রতিশ্রুতি পালন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, জগদীশ্বর আমাদের প্রতিকার্য্যে সহায় ও অবলম্বন হৌন—কায়মনে এই প্রার্থনা করি।"

কমলবাসিনী সায় দিয়া বলিলেন—"ঠিক বলেছেন অনাদিবাবু! একা—অসহায়া নারী আমি, সংসারের সহস্র আবর্ত্তের ভিতরে পড়েও যে এখনো পর্য্যন্ত স্থির লক্ষ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছি, সে কেবল তাঁরই কৃপার বলে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আপনাদের গচ্ছিত নলিনের ভার আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারছি, ততক্ষণ আমারও আর দ্বিতীয় প্রার্থনা নাই।"

আচম্বিতে বিজলীর বুক ঠেলিয়া এমন একটা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস হুস্‌ করিয়া বাহির হইয়া গেল যে, কমলবাসিনী ও অনাদিনাথ একসঙ্গেই চম্‌কাইয়া তাহার পানে চাহিলেন। বিজলী তাড়াতাড়ি আত্মসম্বরণ করিয়া বলিয়া উঠিল—"আমি কিন্তু মা, সংসারের বন্দোবস্ত এ রকম রাখতে পারবো না। এ যেন বড়ই ফাঁকা ফাঁকা, হঠাৎ মন অবসন্ন হয়ে দমে যায়। আমি চাই চারিদিকে প্রফুল্লতা—সর্ব্ব বিষয়ে তৎপরতা, তাতে মন উদ্দীপ্ত থাকে।

তোমার এই তারিণী...না—কি, কি নাম? ও—তড়িতাকে নিয়ে... আমার চলা দায় হবে দেখছি। এখনও—পর্য্যন্ত তার সাড়াটি নেই... কি আশ্চর্য্য!"

—"তোমার নিজের সংসার—নিজের ঘরবাড়ী, যেমন সুবিধা বুঝবে, তেমনি বন্দোবিস্ত করে নেবে। কাজ কি তোমার তড়িতাকে?...দরকার হয়, মনের মত লোক গ'ড়ে নিয়ো।" বলিয়া, কমলবাসিনী অনাদিনাথের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন। কিন্তু অনাদিনাথ ঈষৎ গম্ভীর হইয়াই বলিলেন—"কিন্তু আমরা যে বুড়ো হয়ে জ্যোতিঃহারা হয়ে পড়েছি, আমাদের যে প্রতিপদেই তড়িতালোকের প্রয়োজন।"

কমলবাসিনী ব্যস্ত হইয়া ডাকিলেন—"তড়ি—তড়ি—এসেছিস্?"

—"যাই মাসিমা!"

তড়িতা শশব্যস্তে সাম্‌লাইয়া লইয়া, ত্বরিতে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্রই অনাদিনাথ একবার কাঁপিয়া উঠিয়াই, গভীর বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন! কমলবাসিনী তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া হাসিয়া বলিলেন—"আপনার বিস্মিত হবার কারণ যথেষ্ট আছে, এদের দু'জনের চেহারার সাদৃশ্য আশ্চর্য্যজনক বটে, এমন সাদৃশ্য পৃথিবীতে বড় দেখা যায় না।"

বিজলীও একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল। ক্ষণ পূর্ব্বের সমস্ত উত্তেজনা মুহূর্ত্তের ভিতরেই কোথায় যে অন্তর্হিত হইয়াছিল, মুখে আর কথা যোগাইতে ছিল না। সহসা অনাদিনাথ বলিয়া ফেলিলেন—"মা বিজলী, সহস্র পরিচারিকা নিযুক্ত করলেও, এমন সঙ্গিনীর স্থান পূর্ণ করতে পারবে না।"

তড়িতা মৃদু হাসিয়া অনাদিনাথের প্রতি একবারমাত্র কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল, এবং পরক্ষণেই বিজলীর দিকে ফিরিয়া সেই হাসিটুকু

তাহাকে উপহার প্রদান করিয়া নীরবে আপন কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

কিন্তু বিজলী কিছুতেই তাহার পূর্ব্ব প্রফুল্লতা ফিরাইয়া আনিতে পারিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, যাহার সহিত চেহারায় এরূপ আশ্চর্য্য সাদৃশ্য, তাহার সহিত অন্তরের পার্থক্য থাকিলেও, ভাগ্যসূত্র যেন কোন্‌খান দিয়া একটুখানি জড়িত হইয়া রহিয়াছে! কিন্তু সে যে কোন্ খানে এবং কি ভাবে, তাহা কিছুতেই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, উভয়ের উপরেই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। তড়িতা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই সে বলিয়া বসিল—"চল্লে যে এখনি!...দাঁড়াও, পরিচয় হোক।"

কণ্ঠস্বরে এবং ভঙ্গিতে এমন একটা অবজ্ঞাসূচক কর্ত্তৃত্বের ছায়া ফুটিয়া উঠিল যে, তড়িতার সারা মনটুকু একেবারে তিক্ত হইয়া গেল। সে জবাব করিতে পারিল না. ফিরিয়া কমলবাসিনীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইল। কমল বিরক্ত হইয়া ধমক দিলেন—"একটু সভ্যতাও শেখনি বাছা? থাকলেই বা তোমার রান্নার তাড়া?...পরিচয়টাও তো করে যেতে হয়?...জান—এখন থেকে ওঁরই অধীন তুমি?"

বড় রকমের একটা জবাব মনে আসিলেও, তড়িতা তাহা মুখে ফুটিতে দিল না, নতমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। বিজলী ইচ্ছা করিয়াই, একটু বেশী রকম ছুঁচ্ ফুটাইয়া বলিল—"ইতর-ভদ্রের তফাৎ কোথায় যাবে মা, সে যে স্বভাবজাত।"

বলিয়াই গর্ব্বভরে মাথা উঁচু করিয়া বসিল। কমলবাসিনী কি বলিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া অনাদিনাথ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—"এ কি মা বিজলী, শিক্ষিতা তুমি—অকারণে নির্দ্দোষীর প্রতি অবিচার করো না।... যাও মা তড়িতা—তুমি আমাদের খাবারের ব্যবস্থা কর গিয়ে। বেশী রাত

হয়ে গেলে তোমার এই রুগ্ন, বুড়ো ছেলেটা ক্ষিদেতে অধীর হয়ে উঠবে।”
অনাদিনাথ তড়িতার পানে চাহিয়া মধুর হাসিলেন। তড়িতা রক্ষা পাইল এবং বৃদ্ধের মুখের উপরে আর একবার সজল করুণ আঁখি দুটি নিবদ্ধ করিয়া, অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়া দিয়া, এমন ভাবে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল যে, অনাদিনাথের বুকের ভিতরে তাহার সেই চাহনি খোঁচার মত বিঁধিয়া চোখে জলধারা টানিয়া আনিতে লাগিল। অনাদিনাথ উদাসভাবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

বিজলী কমলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—“বাবার এই দুর্ব্বলতাটুকু জীবনে আর গেল না। যখন তখন এমনি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়েন, যেন জিনিষটা ভয়ানক সস্তা!”

কমলবাসিনীও কেমন-একটু বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলেন, সহসা কথা কহিতে পারিলেন না, কিন্তু অনাদিনাথ কহিলেন—“সারাজীবন যে দুর্ব্বলতার সঙ্গে জড়িত হয়ে আজ এই পথের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছি, সে যে সঙ্গের সাথী হয়ে গেছে! তাকে ত্যাগ করতে গেলে আজ যে আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না!...কিন্তু, একটা কথা শুনে রাখ, যতই শিক্ষিতা —যতই বুদ্ধিমতী হওনা কেন তোমরা, মানুষ চিন্‌তে তোমাদের এখনো ঢের বাকী মা!”

অনাদিনাথ মৃদু হাসিয়া কথাটা শেষ করিলেন বটে, কিন্তু কেহই জবাব করিতে পারিল না। সহসা যেন একটা ধূসর ছায়া, নিবিড়-কুয়াসার আবরণের মত কমল ও বিজলীর হৃদয়ের অভ্যন্তরে আনন্দের দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকালের জন্য সকলেই আন্‌মনা হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন।

আহারাদির পরে, একটু বেশী রাত্রে কমলবাসিনী যখন বিশ্রাম করিতে গেলেন, তখন তড়িতা ধীরে ধীরে তাঁহার কাছে আসিয়া মাথা নীচু করিয়া

দাঁড়াইল। বিরক্তিভরে কমলবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি চাই—কিছু বল্‌বে ?"

—"হ্যাঁ মাসিমা,"

—"বল, সঙের মত খাড়া হ'য়ে থেক না।"

তড়িতা অত্যন্ত কষ্টে চোখের জল রোধ করিয়া দাঁড়াইল, এবং বার দুই গলা ঝাড়িয়া বাধ-বাধ করিয়া, শেষে সহজ স্বরে কহিল—"আপনার আশ্রয়ে থেকে এতদিন মানুষ হয়েছি, আপনি হৃষ্টমনে অনুমতি না দিলে তো চলে যেতে পারি না!"

সহসা সুপ্তোত্থিতার মত অবাক হইয়া কমলবাসিনী একদৃষ্টে তড়িতার মুখের পানে চাহিলেন। মনে মনে যে প্রশ্নের সমাধানের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন, তড়িতার কথায় তাহারই আভাস পাইয়া সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করিলেন—"সে কি!...চলে যেতে চাও এখান থেকে ?"

—"আর কেন মাসিমা! যেখানকার প্রতি পরমাণুটির সঙ্গে আমার মৃতা জননীর পুণ্যস্মৃতি জড়িত হয়ে রয়েছে, যাঁর আদরে—উৎসাহে—কথায়—স্নেহে, যে পবিত্র গৃহে আমার নারী-হৃদয় প্রথম জেগে উঠেছিল, সেই গৃহে —আমার সেই পবিত্র তীর্থস্থানে আর তোমার স্নেহভরা হৃদয়ে—অশান্তির আলো জেলে রেখে আমি কতদিন টিক্‌তে পারবো মাসিমা ? —একি মানুষে পারে ?"

ঠিক এই কথাটাই ভাবিয়া কমলবাসিনী অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। নলিন যতই মাতৃভক্ত হোক, তবুও তড়িতার বিদ্যমানে বিজলীর সহিত পরিণয়ে শুধু তাহার একার নহে—এই তিনটি প্রাণীর হৃদয়েই যে অশান্তির অনল জ্বলিয়া উঠিবে, এবং তাহার নির্ব্বাণ যে কোথায় হইবে, তা ভাবিতেও তাঁহার মন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। অথচ যাহাকে এতকাল ধরিয়া সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে আশ্রয় দিয়া মেয়ের মতই প্রতিপালন করিয়া

ছেন, হঠাৎ তাহাকে তাড়াইয়া দিবেন—এই ভাবিয়া তাঁহার নারী-হৃদয় মাথা নাড়া দিয়া উঠিতেছিল, বিশেষ করিয়া নলিনের ভয়! এ ব্যাপারের কোন প্রকার সন্দেহ ঘুণাক্ষরেও তাহার মনে ঢুকিলে, তাহার মাতৃভক্তি যে কতক্ষণ অটল থাকিবে, তাহা ভাবিতেও মনে উৎকণ্ঠার তুফান বহিয়া যায়! সহসা তড়িতার এই অপ্রত্যাশিত আচরণে তাঁহার নারী-হৃদয় আর একবার সজাগ না হইয়া থাকিতে পারিল না। সানন্দে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া আবেগভরে কহিলেন—"মা—তুমি আমার বুদ্ধিমতী মেয়ে! হৃদয়ের স্পন্দন হৃদয় দিয়েই অনুভব করতে পার। কিন্তু আমার পক্ষে এ যে বড় নির্ম্মম—বড় কঠোর কর্ত্তব্য মা?"

তড়িতা একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া জবাব করিল—"তার আর উপায় কি মামীমা, সংসারে সকলেই যে কর্ত্তব্যের দাস। কর্ত্তব্যের প্রভুত্ব সকলকেই মাথা পেতে বহন করতে হবে—তা যত নির্ম্মম—যতই কঠোর হোক! ...তাতেই পুণ্য, তাতেই ধর্ম্ম। আশীর্ব্বাদ কর—যেন সহস্র প্রলোভনেও তোমার এই অভাগিনী মেয়েটা কখনো কর্ত্তব্যের পথ হতে বিচ্যুতা না হয়।"

তড়িতা কমলকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল। সহসা কমলবাসিনীর এত দিনের স্বভাবজাত দুষ্টবুদ্ধি নিমেষে কোথায় অন্তর্হিত হইল। আজ তাঁহার স্পষ্ট মনে পড়িল—এই তড়িতাকে তিনি কন্যার মতই ভালবাসিতেন! উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কহিলেন—"না তড়ি, তোকে আমি এমন নিঃসম্বল অবস্থায় যেতে দিতে পারবো না—মেয়ের মতই বিদায় দেব। যেখানে থাকিস—যা করিস, লুকিয়ে আমাকে চিঠি লিখিস, অনাটনে তোকে কষ্ট পেতে হবে না!...একটুখানি এইখানে অপেক্ষা কর মা!" বলিয়া, অধীর আহ্লাদে এবং সুপ্ত অনুতাপের ভারে নত হইয়া ধীর-পাদক্ষেপে নিজের কক্ষে চলিয়া গেলেন। কিন্তু ক্ষণকাল পরে, যখন গোটা

কতক টাকা লইয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন, তখন আর তড়িতার সাক্ষাৎ পাইলেন না। তাহার কক্ষে ঢুকিয়া দেখিলেন—যেখানকার যে জিনিস, ঠিক তেমনি পড়িয়া আছে, নাই কেবল তড়িতা!...কমলবাসিনী অনেকক্ষণ অনেক রকমের চিন্তার বিশ্লেষণ করিলেন, তারপর একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সদরের দরজা বন্ধ করিয়া আসিয়া শয়ন করিলেন।

...এদিকে, শেষ রাত্রে ষ্টেশনে নামিয়া, গৃহে যাইবার পথের মুখে—হঠাৎ তড়িতাকে একাকিনী দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ আশ্চর্য্য হইয়া গেল! তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া ডাকিল—"তড়িত্—তড়ি—"

পিছন ফিরিয়া, তাড়াতাড়ি পলাইতে গিয়াও তড়িতা পারিয়া উঠিল না, থতমত খাইয়া, মুখ নীচু করিয়া স্পন্দিত চক্ষে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। ষ্টেশনের ক্ষীণালোকে, ক্ষণকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক উত্তম-রূপে দেখিয়া, নরেন্দ্র স্নেহের ভর্ৎসনা করিয়া কহিল—"ছি বোন, একি! আমার সঙ্গেও প্রতারণা!...সব বুঝেছি আমি। যে দিন কল্‌কাতায় অনাদিবাবুর বাড়ীতে গিয়ে শুনেছি যে, তাঁরা বাপ-বেটীতে এখানে আসবেন, সেইদিন থেকেই আমার মনে এমনি একটা সন্দেহ...যাক্ কিন্তু ভাগ্যে বিশেষ একটা কাজে পড়ে আজ আমায় এখানে আসতে হয়েছিল! এখন এস আমার সঙ্গে।"

—"আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন?"

—"আর কোথায়—বাড়ীতে। জানতো পিসীমা মারা যাবার পর থেকে আর বড় একটা এদিকে আসতেই পারিনি। বাড়ী-ঘর সব চাবিবন্ধ পড়ে রয়েছে। সেই সুবিধা পেয়ে আমার এক জ্ঞাতি খুড়তুতো ভাই ফাঁকি দিয়ে বিষয়ের বখরা নেবার চেষ্টায় মোকদ্দমা সুরু করেছে। তারই কতকগুলো দরকারী কাগজ পত্র নিতে এসেছি।"

—"কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে কোথায় যাব?"

—"উপস্থিত আমার বাড়ীতে।...ভয় নেই—কেউ জানবে না, আবার দশটার গাড়ীতেই কলকাতায় চলে যাব।...উমা তোমার জন্যে ভেবে ভেবে আকুল হয়েছে, যতক্ষণ না তার কাছে তোমায় হাজির করে দিতে পারি, ততক্ষণ তুমি আমার হাত থেকে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাবে না;... জানতো—কেমন নাছোড়বান্দা দাদা তোমার ?"

টপ্ টপ্ করিয়া গোটাকতক বড় বড় জলের ফোঁটা তড়িতার চক্ষু হইতে ঝড়িয়া পড়িল, অশ্রুসজলকণ্ঠে কহিল—"বড় অনাথা আমি, এ জন্মের বোঝা—"

—"চোপ্, মেডিক্যাল কলেজের সিনিয়ার হাউস সার্জ্জেন—নামজাদা নরেন ডাক্তারের বোন অনাথা!...যা বলেছো তা বলেছো, কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি—খবরদার এমন কথা আর মুখেও কোন দিন এনো না! শেষটায়—তুমি আমার পশার মাটী করতে চাও?...উমা এ কথা শুনলে তোমার কি হাল করবে জান?"

মৃদু হাসিয়া তড়িতা প্রশ্ন করিল—"ভাল আছে সে?...আমার কথা এখনও মনে করে?"

—"ভাল থাকবে না তো আমাকে জ্বালাবে কে? বাপ্—একদণ্ড কি রেহাই পাবার জো আছে? দিন-রাত কেবল দাদা আর দিদির কথা নিয়ে আমার মাথা বিগড়ে তুল্লে!...তার ঠেলাতে পড়েই তো—জেরার চোটে—দাদার মুখ দিয়েই, দাদা-দিদির সমস্ত গুপ্তকথা ব্যক্ত হয়ে গেল, নইলে নলিনটা এমনি বেইমান—আমার কাছেও কি প্রকাশ করেছিল নাকি?"

সহসা সান্ধ্য-কমলের মত তড়িতার মুখখানি যে বিরস বিবর্ণ হইয়া গেল, তা' সেই ক্ষীণ আলোকেও নরেন্দ্রের দৃষ্টি এড়াইল না। প্রসঙ্গটাকে ফিরাইবার জন্য নরেন্দ্র বলিয়া উঠিল—"আমার আর উমার কাছে তোমার

লজ্জা নেই বোন, অন্ততঃ এ দুটী প্রাণীকে পৃথিবীর ভিতরে তোমার সব চেয়ে আপনার বলে জেনো। আমাদের কাছে মনের কোন কথা—কোন ভাবই গোপন করো না। যাক্,…মাগীর কিন্তু কি কঠিন পাষাণে গড়া প্রাণ! কোন্ বিধাতা ওঁকে সৃষ্টি করেছিল ভেবে পাই না। নলিনের মত অমন মাতৃভক্ত ছেলে, তার প্রাণেও এমন আঘাত করতে মায়ের প্রাণ একটুও কাতর হল না! কাল নলিনের চিঠি পেয়েছি—সে বেচারাকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেছে, কোন খবর জানতে দেয়নি।…পরীক্ষা শেষ হবার আগে থাকতেই মাগী এমন যোগাযোগ করে রেখেছিল যে, পরীক্ষা দিয়েই অমনি হাওয়া বদলের জন্য পুরীতে যেতে বাধ্য হয়েছে।…কি ভাগ্য যে উমার ঠেলায় পড়ে সেদিন জোর করে তার কলেজে গিয়ে, ধরে আমাদের বাড়ীতে এনেছিলুম, নইলে দেখাও হত না।…আহা বেচারা তোমায় দেখবে বলে বাড়ী ফেরবার জন্যে দিন গুনছে! কত কথা যে চিঠিতে লিখেছে পড়্‌লে বুক ফেটে যায়। কিন্তু বাড়ীতে এসে যখন তড়িতার বদলে দেখবে বিজলীকে, তখন মাগী তাকে কি বলে বোঝাবে তা শুনতে ইচ্ছা হয়।…যাক্—ওই একখানা ঘোড়ার গাড়ী আসছে, এস।"

তড়িতা কলের পুতুলের মত নিঃশব্দে নরেন্দ্রের অনুসরণ করিল।…

…পরদিন সন্ধ্যার গাড়ীতে দীর্ঘকালের পরে গৃহে ফিরিয়া নলিন, অনাদিনাথ ও বিজলীকে দেখিয়া হঠাৎ এমনভাবে চমকাইয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল যে, তাহার মুখ দিয়া আর কিছুতেই একটা কথাও বাহির হইল না। কমলবাসিনীও এই অবসরের জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। ছুটিয়া আসিয়া পুত্রের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু ও মুখে এমন একটা অস্বাভাবিক বিষণ্ণতার ভাব ফুটাইয়া তুলিলেন যে, দেখিয়া একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় নলিনের বুক কাঁপিয়া উঠিল। তার ক্ষীণ শিথিল কণ্ঠ হইতে আপনা আপনি অস্পষ্ট মৃদু স্বর বাহির হইয়া গেল—

—"তুমি কি অসুস্থ মা ?"

—"শারীরিক তত নয়, মনের অসুস্থতা যত বেশী।"

নলিন আর ভরসা করিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। ইতি মধ্যে বিজলী সরিয়া গিয়াছিল, অনাদিনাথ বলিয়া উঠিলেন—"বোস বাবা, আর যে তোমায় দেখতে পাব এ জীবনে সে আশা ছিল না।"

—"এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন আশা করি—"

মৃদুস্বরে বলিতে বলিতে নলিন উপবেশন করিল। অনাদিনাথ সে কথার জবাব না দিয়া ডাকিলেন—"বিজু—বিজু—বিজলী—মা!...হুঁঃ তা'র কি এখন সময় আছে যে ডাকাডাকি করলে জবাব দেবে!"

কমলবাসিনী মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"আপন হাতে চা প্রস্তুত করে আনছেন,...এই যে—"

বিজলী আসিয়া, হাসিতে হাসিতে চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়া দিতে সুরু করিল।...

...রাত্রে শুইতে যাইবার আগে নলিন একেবারে পাংশুবর্ণ মুখে মায়ের কাছে গিয়া হতাশভাবে প্রশ্ন করিল—"একটা সত্যি কথা জিজ্ঞেস্ করবার সাহস দেবে মা?...এই যে গুজবটা শুন্‌ছি— এটা কি?"

—"কি গুজব বাবা?"

—"তড়িতার সম্বন্ধে?"

কমলবাসিনী নতমুখে ধীরে ধীরে জবাব দিলেন—"কাল সকাল থেকে তাকে পাওয়া যায় নি।...লোকে ব'লছে—"

—"লোক তো—তোমারই ইস্কুলের টিচাররা...যাক্!...আমার চিঠি-পত্রগুলো সে সব পেতো কি?"

এ প্রশ্নের জন্য কমলবাসিনী মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না, সুতরাং চতুর হইয়াও নিজের চাঞ্চল্য গোপন করিতে পারিলেন না। মুহূর্ত্তকাল

ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"অত খবর রাখবার কি আমার সময় ছিল বাবা ?"

একটা প্রবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, নলিন ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। অগাধ স্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কমল শান্ত গম্ভীর স্বরে কহিলেন—"জগদীশ্বর যা করেন, সমস্তই মঙ্গলের জন্য বাবা, আমরা তাঁর সৃষ্ট জীব, আমাদের কর্ত্তব্য শুধু তাঁর বিধানকে মাথা পেতে গ্রহণ করা ! তিনি সচ্চিদানন্দ মঙ্গলময় ! আজ কেবল এই কথাটা মনে কর নলিন যে,—মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছাই পূর্ণ হোক !"

———

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

*　　　*　　　*　　　*

তার পর—এক আধ দিন নয়, দীর্ঘ—ছয় বৎসর পরের কথা।—

বিকালবেলা জোর করিয়া তড়িতার চুল বাঁধিতে বসিয়া উমা বিরক্ত হইয়া বলিল—"অন্যায় করেছি, না বুঝে সর্পের গর্ত্তে খোঁচা দিয়ে অস্থির হয়ে পড়েছি—কিছুতেই আয়ত্ব করতে পারছি না বাপ্—কি সর্ব্বনেশে চুলের গোছ!"

—"একশোবার তো মানা করেছিলুম, তুই পোড়ারমুখী শুনলি কই? এখন তেমনি ফল ভোগ কর।" বলিতে বলিতে হাসিয়া, তড়িতা তাহার চুলের গোছা টানিয়া লইতে গেল। উমা বাধা দিয়া কহিল—"আহা-হা—রোস না, ব্যস্ত হও কেন? তুমি যেমন একরোখা মেয়ে, তোমার এই চুলগুলোও ঠিক তেমনিতর দিদি, কিছুতেই বাগ মানতে চায় না।...এ খালি তোমার নিজের দোষেই হয়েছে। এত চুলের রাশ—অযত্নে ফেলে রাখলে কি বশে থাকে কখনো?"

—"যত্ন করবার সময় পেলুম কবে যে চুলের পাট কর্‌তে বস্‌বো—তা বল্? কলেজে গিয়ে রোগীর সেবা করবো, হাঁসপাতালে ডিউটি খাটবো, ব্যাণ্ডেজ করতে শিখবো, একজামিনের পড়া তৈরী করবো—না, তোর মত নিশ্চিন্ত হয়ে চুল বাঁধতে বসবো?...আচ্ছা ছেলেমানুষের পাল্লায় পড়া গেছে!"

—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সে নয়,—যখন কলেজে পড়তে, তখনকার কথা বাদ

দাও, কিন্তু এখন—এই পাশ করে, ধাত্রী আর নার্স হয়ে বেরোবার পরেও তো বছর কেটে গেল—এখন বাঁধনা কেন? কত খোসামুদি করেছি—মাথা-মুড় খুঁড়েছি, কিন্তু হেসে সব উড়িয়ে দিয়েছ,...আমার কোন্ কথাটা শুনেছ তুমি?"

তড়িতা স্মিতমুখে আদরের স্বরে কহিল—"ওরে পাগল!—বেশ-ভূষা—সাজগোজ করে কি ধাত্রী-গিরি করা চলে, না—ভদ্দর লোকের বাড়ীতে গিয়ে রোগীর সেবা করা যায়? লোকে কি মনে ভাববে বল্ ত?"

—"কেন, তুমি তো ওঁর সঙ্গে ছাড়া একলা অন্য কোথাও যাও না, আর উনিও যেখানে সেখানে তোমায় নিয়ে যান না, তবে দোস কি? আর এই যে কলকাতায় কত সিক্নার্স আর মিড্ওয়াইফ দেখতে পাই, সবাই তো সেজেগুজে বেড়ায়—তাতে দোষ হয় না, আর দোষ হবে কেবল বুঝি তোমারই বেলাতে?"

—"যে সাজগোজ করে করুক গে—আমার অত দেখবার দরকার নেই, আমার ভাল লাগে না—বাস্ ফুরিয়ে গেল!"

—"ছিঃ দিদি, ভগবান-দত্ত এই যে অতুল সৌন্দর্য্য রাশি পেয়েছ, এ কি অবহেলায় নষ্ট করতে আছে?"

—"যা—যাঃ...জ্যাঠানো করিস্নি।" বলিয়া, তড়িতা নিজের চুলের রাশি টানিয়া লইয়া, পিছন দিকে একটা ঢিবির মত করিয়া কাঁটা গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল—"শীগ্গির আয়, তোর চুল বেঁধে সাজিয়ে গুজিয়ে দিয়ে যাই। বড়বাজারে রোগী ফেলে এসেছি, জানিস্তো—এক্ষুনি দাদার সঙ্গে আবার ছুটতে হবে;...দেরী করতে পারবো না।"

অধরকোণে কুটীল হাসি হাসিয়া, উমা একটা অর্থসূচক কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল—"তা যাই বল, শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে কেউ পারে না দিদি,—তুমি এখনো তাঁকে ভুলতে পারনি!"

তড়িতা হাসিয়া ফেলিল, বলিল—"তুই ভুল্‌তে পেরেছিস কি ?"

উমা আশ্চর্য্যভাবে চাহিয়া কহিল—"আমি ভুলবো কেন ?…আর এত উপকারী যিনি—তাঁকে ভুলে যাওয়াটাই বুঝি খুব উঁচুদরের কর্ত্তব্য ?"

—"আমারও কি তিনি কম উপকারী নাকি ?"

—"না, সেই জন্যেই তো কথাটা পেড়েছিলুম !"—বলিয়া, উমা বিজ্ঞের মত গম্ভীর স্বরে কহিল—"তাঁকে ভুলতে পারনি, পারবেও না দিদি !—আর তা উচিতও নয়। কিন্তু তবুও কেন যে তাঁর কাছ থেকে নিজেকে এমনভাবে গোপন করে রেখেছ, তা ভেবে পাই না। তোমার দাদাটিও জুটেছে তেমনি !…অতবড় অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে কেবলই জোচ্চুরি করছে, তাঁর কাছে তোমার অস্তিত্বই একেবারে লোপ করে দিয়েছে ! যেন তড়িতা বলে কারও নাম পর্য্যন্ত কখনো শোনে নি সে —"

তড়িতা মুখ টিপিয়া কেবলমাত্র ঈষৎ হাসিল। উমা উষ্ণ হইয়া পুনরায় কহিল—"এ সব ওঁর ভা-রি অন্যায়, তাঁর সকল খবর তোমাকে এনে দিচ্ছেন, কিন্তু তোমার খবর তাঁকে দেবার বেলাতেই যত জোচ্চুরি ! এ সব আমি মোটেই সইতে পারিনি—"

—"না পারিস তো—চুপি চুপি নয় গোয়েন্দাগিরি কর।" বলিয়া উমার খোঁপা বাঁধিয়া তড়িতা গুম্ করিয়া একটা কীল মারিয়া তাহা বসাইয়া দিল।

উমা বলিয়া উঠিল—"করতুম কি না দেখতে পেতে, যদি তাঁর এটা বিপদের সময় না হোত !…সত্যি দিদি, এক এক বার এমন রাগ হয় তোমার উপর যে—কি বলবো !…এমন কঠিন প্রাণ তোমার…আগে জানলে—"

—"আমার হয়ে তুই গিয়ে তাঁর কাছে বদ্‌লি খাটতিস্ ?"

তড়িতা রহস্যভরে হাসিল, কিন্তু উমা চোখ রাঙাইয়া বলিল—"যাও

ভা-রি বুদ্ধিমান !...তুমি তোমার দাদার ঘরে সেই জন্যে এসেছ বুঝি ? না দিদি—এ সব ঠাট্টা-তামাসার কথা নয়। তাঁদের কথা ভেবে আমার মনে বড় কষ্ট হয় !...এই সমস্ত অনিষ্টের মূল কারণ তুমিই।”

—“কেন, আমি কি হিংসা করে বিজলীর ঘাড়ে ব্যামো চাপিয়ে দিয়ে এসেছি নাকি ?”

—“সেও বরং ছিল ভাল। সেখানে থেকে যদি বিজলীর উপর হিংসা করতে, তার সঙ্গে ঝগড়া করতে, তা'হলেও দাদা আমার সুখী হ'তে পারতো, কিন্তু এই যে চুপি চুপি পালিয়ে এসে চিরকালের জন্য গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছ—এতেই তাদের সর্ব্বনাশ করেছ।”

এতক্ষণ পরে, তড়িতা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গম্ভীরস্বরে কহিল—“তার ফল তো আমিও পেয়েছি ভাই, যে মিথ্যা কলঙ্ক আমার নামে রটেছে—”

বাধা দিয়া উত্তেজিত ভাবে উমা বলিয়া গেল—“জনকনন্দিনীর নামেও অমনি মিথ্যা কলঙ্ক রটেছিল, তাতে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে তাঁর আদর আর গৌরব আরো বেড়েছিল বই কমে নি। মিথ্যা—চিরদিনই মিথ্যা, তা কখনো স্থায়ী হতে পারে না। সে কথায় দাদার মোটেই বিশ্বাস হয়নি, বরং তাঁর মায়ের উপরেই ঘোরতর সন্দেহ হয়েছিল। তাই তোমাকে ভোলা দূরের কথা, মনে মনে দিনরাত ভেবে ভেবে বৌদিদিকে একটুও ভালবাসতে পারেন নি। তারপর যিনি সে কথা অন্যায় ক'রে রটিয়েছিলেন, সেই সর্ব্বনাশী মা মারা যাওয়ার পরে, সকল সত্য কথা যখন প্রকাশ হয়ে পড়লো, তোমার উপরে তাঁর দুর্ব্ব্যবহারের কথা শুনলেন, তখন থেকে তোমার ছবি ধ্যান করেই দিন কাটাতে লাগলেন,...বিজলীকে আর—”

এবার তড়িতা বাধা দিয়া বলিল—“মিথ্যা কথা !...বিজলীকে তিনি

একটুও অনাদর বা হেনস্থা করেন না, বরং অতিরিক্ত রকম আদর-যত্ন করে থাকেন—শুনেছো তো?”

বিজ্ঞের ভাবে ঘাড় নাড়িয়া—চোখের ভঙ্গিমা করিয়া উমা জবাব করিল —“হ্যাঁ, তা করে থাকেন কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে। দাদা অত্যন্ত মহৎ বলেই, কর্ত্তব্যেরও অতিরিক্ত আদর যত্ন করেন। কিন্তু তাতে কি মেয়ে-মানুষের প্রাণ ভরে দিদি?...তোমার দাদা যদি আমাকে রাজরাণীর আদরেও রাখতেন আর একটুও ভাল না বাসতেন, তা হলে যে আমি পাগল হয়ে যেতুম! বৌদিদিরও তো সেই দশা। সে মনে মনে দিবারাত্রি স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে, তার স্বামী তার নিজের নয়, সে যেন কোন্ পরের জিনিস চুরি করে নিয়ে দুদিনের জন্য ভোগ করছে মাত্র, একদিন ধরা পড়ে শুধু যে সেই জিনিসটি ফিরিয়ে দিতে হবে, এমন নয়, চোরের শাস্তিও তাকে কড়ায় গণ্ডায় মাথা পেতে নিতে হবে।...এই মনের আগুনে পুড়ে পুড়েই তো বাপের মত হৃদ্‌রোগে পড়ে বিজলী আজ মরতে বসেছে! আহা তিন বছরের ওই একটি মাত্র সন্তান—জ্যোছনা—অজ্ঞান শিশু, তার দশা ভাবলেও আমার বুক ফেটে যায়!...কি হবে বল তো?”

তড়িতার চোখ ছল-ছল করিয়া আসিল, অশ্রুসজল কণ্ঠে কহিল—“ঠিক বলেছিস, আমিই এর জন্যে দায়ী ভাই, কিন্তু—কিন্তু—না না ঈশ্বর বিজলীকে রক্ষা করুন! পশ্চিমে হাওয়া বদ্‌লে এসে তার শরীর সেরে গেছে, এবারকার এ সামান্য অসুখ শুনেছি—কিছুই নয়।”

—“না দিদি, ওঁর মুখে শুনেছ তো? তিন চার মাস ধরে পশ্চিমে ঘুরে ঘুরে বৌদিদির শরীর সেরে আসছিল বটে, কিন্তু ফেরবার মুখে—মধুপুরে আসতেই আবার হঠাৎ বেড়ে উঠেছে। তে-রাত্তিরও সেখানে থাকতে পারেনি—ছট্‌ফটিয়ে দেশে চলে এসেছে, বলেছে—মধুপুরে নিয়ে গেছলে কেন?”

—"তাতে দোষ হয়েছে কি, মধুপুর তো ভাল জায়গা—আর সেখানে ওঁদের নিজের ঘর-বাড়ী বাংলা আছে—"

—"হ্যাঁ—তাই তো দাদা আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে—মধু-পুরে যাওয়াতে দোষ হয়েছে কি? সে কথায় নাকি রেগে উঠে জবাব করেছে 'মধুপুরে আমার যম আছে জান না ?'...কে জানে কি রহস্য !"

তড়িতা ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে উমার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া, সহসা বলিয়া উঠিল—"সত্যি নাকি ! কই—এ কথা তো আমি শুনিনি ?...তুই শুনলি কবে ?"

উমা জবাব করিল—"এই চারদিন আগে, শেষ যেদিন চাতরায় গিয়ে তাকে দেখে এসেছেন। সেই থেকে তো আর এ ক'দিন সেখানে যেতে পারেন নি, আর দাদাও বলে দিয়েছেন যে, এখন ঘন ঘন কাজ ক্ষতি করে তোমার আসবার দরকার নেই,—দরকার বুঝলে টেলিগ্রাফ করবো। ...তুমি তখন দিন-রাত সেই কুমারটুলির জমীদারের মেয়ের কাছে বিব্রত ছিলে, তাই তোমাকে বোধ করি, বলতে ভুলে গেছেন।"

—"তা হলে আর আমার একলার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছিস কেন ?" বলিয়া, তড়িতা ম্লানভাবে ঈষৎ হাসিল। উমা, আশ্চর্য্যভাবে তাহার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"তাতে কি হয়েছে ?"

—"ওতেই সব রোগের মূল ধরা পড়ে গেছে।"

—"সে কি, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না ?"

—"পারবি না—তোর বুঝে কাজও নেই !"

—"না দিদি, তোমার পায়ে পড়ছি—বল।"

—"বল্লেও বুঝতে পারবি না, তোদের শিক্ষা-সংস্কার এক রকমের, আর আমাদের শিক্ষা-সংস্কার অন্য রকমের, তোর বোঝবার দরকার নেই উমা !"

—"না না—তোমায় বলতেই হবে, বল।"

—"তবে মোটামুটি এইটুকু শুনে রাখ যে, আমিও যেমন সেখান থেকে পালিয়ে এসে তোদের এখানে থাকতে বাধ্য হয়েছি, বিজলীলতাও তেমনি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে—দায়ে পড়ে তোর দাদাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল !"

—"অ্যাঁ, বল কি !" বলিয়া উমা গালে হাত দিয়া কহিল—"ওমা এ যে অবাক করলে তুমি !"

—"তোর কাছে তো অবাক্ ঠেক্‌বেই,...কিন্তু সত্যি।"

বাম হস্তে বাম গণ্ড ন্যস্ত করিয়া উমা ক্ষণকাল নির্নিমেষ নেত্রে তড়িতার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপরে একটা ভারী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তা যাই হোক দিদি, সে যদি রক্ষা না পায় তো ওই একরত্তি দুধের বাছা মেয়েটার কি হবে বলতো ?"

তড়িতার চক্ষু আবার ছলছল করিয়া উঠিল, ভারী গলায় বলিল—"জগদীশ্বর বিজলীকে রক্ষা করুন, ধর্ম্ম জানেন—কারো উপরে আমার বিন্দু-মাত্রও দ্বেষ, হিংসা কি আক্রোশ নেই।...জ্যোৎস্নার কথা ভাবলে আমিও আকুল হয়ে পড়ি ভাই।"

—"জানি দিদি, তোমার মন জানতে আমাদের কারুর বাকী নেই।" বলিয়া উমা দুই হাতে তড়িতার দুখানি হাত ধরিয়া তাহার বুকের কাছে আপন গলাটিকে আনিয়া রাখিল। আদর করিয়া তড়িতা তাহার মুখচুম্বন করিতে যাইতেছিল, সহসা ব্যস্তভাবে ভিতর-বাড়াতে আসিয়াই, নরেন্দ্র ক্ষুব্ধভাবে বলিয়া উঠিল—"বিজলী বুঝি আর রক্ষা পেলে না।"

উভয়েই একসঙ্গে শিহরিয়া শঙ্কাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার পানে ফিরিয়া চাহিল। উমা প্রশ্ন করিল—"খবর পেলে কোথায় ?...ব্যামো বেড়েছে না কি ?"

সে কথার জবাব না দিয়া নরেন্দ্র চিন্তিতভাবে আপনা-আপনি বলিয়া

ফেলিল—"ওই হতভাগাই বেচারার মৃত্যুর কারণ হল দেখছি, ওরই উপেক্ষাতে বিজলী এই সর্ব্বনেশে হৃদ্‌রোগে—"

বাধা দিয়া তড়িতা কহিল—"এমন অন্যায় অনুযোগ করছেন কেন? আপনার মুখেই শুনেছি যে তিনি বিজলীকে যথেষ্ট—"

—"হ্যাঁ, সে দিকে নলিনের একটুও ত্রুটি নেই কিন্তু"—বলিয়াই, থামিয়া গিয়া নরেন্দ্র মূহূর্ত্তকাল নীরবে কি চিন্তা করিতে লাগিল, তারপরে একটা আক্ষেপের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"বলবো আর কি—দুজনেরই অদৃষ্ট! এখন আমার সন্দেহ হয় যে, নলিনের মত বিজলী-লতাও ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটনাচক্রে পড়ে তাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল; তাই (বিবাহিত জীবনে পরস্পর কেউ কারো প্রতি আন্তরিক আকৃষ্ট হয়ে মিলিত হতে পারেনি) পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সেই আন্তরিক উপেক্ষা—সেই অশান্তি—সেই প্রেমের অভাবই বিজলীর এই পীড়ার সূত্রপাত করেছে, ডাক্তার ওষুধ খাইয়ে তার আর করবে কি?...আজ যদি নলিনের মা আর অনাদিবাবু বেঁচে থাকতেন, তা'হলে নিজ নিজ কৃতকর্ম্মের অনুশোচনায় পাগল হয়ে যেতেন।"

—"মা বাপ কি সন্তানের অমঙ্গল সম্ভাবনা জেনে এমন কাজ করতে পারেন?"

একটা উদ্‌গত দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কথাটা শেষ করিয়া তড়িতা মুখখানি নত করিয়া নীরব হইল। উমা বলিয়া উঠিল—"কারুর দোষ হয় নি, সব নিজের নিজের কর্ম্মফলে এই অশান্তিকর অদৃষ্ট গড়ে নিয়ে এসেছিল। নইলে অনাদিবাবুই বা মারা যাবেন কেন? তিনি বেঁচে থাকলেও তো বৌদি সেখানে গিয়ে একটু শান্তি পেতে পারতো?"

—"আর শান্তি! শান্তি পাবে সে মলে!"—বলিয়া নরেন্দ্র বিরক্ত হইয়া কহিল—"বরাতে নেই কিনা, তাই জেদটাও বেড়ে উঠেছে...এমন

সৃষ্টিছাড়া গোঁ কখনো দেখিনি। এত চেষ্টা করলুম কলকাতায় আনবার জন্যে, তা কিছুতেই রাজী নয়, চাতরার বাড়ীতে মরবে তবু কোথাও নড়বে না। আমার এখানে এক বিন্দু নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই, তবু হপ্তায় দুবার করে ছুটতে হচ্ছে, ওদিকে নলিনেরও কারবারের এমন অবস্থা যে, এক দণ্ডা কলকাতা ছেড়ে গেলে চলে না!...তাকেও অনবরত ছুটোছুটি করতে করতে নাজেহাল হয়ে পড়তে হয়েছে।"

উনা সহানুভূতির স্বরে কহিল—"আহা আজ তিন বছর ধরে ভুগে ভুগে তার কি আর মাথা-মেজাজের ঠিক আছে যে, এ সব ব্যাপার সে খতিয়ে দেখবে?...কিন্তু তার সেবা-শুশ্রূষার অভাব হচ্ছেনা তো?...মেয়েটা আছে কেমন?—জ্যোৎস্না?"

—"জ্যোৎস্না ভালই আছে দেখে এসেছি!...আহা তিন বছরের শিশু, কিন্তু কি তার বুদ্ধি—কি তার কথা—শুনলে বুক জুড়িয়ে যায়। তার ভাবনা ভেবেই তার মায়ের অবস্থা আরো সঙ্গিন হয়ে উঠেছে।...অনেকদিন থেকেই বিজলীর এক মাসতুতো বড় বোন এসে তার কাছে রয়েছে, সে-ই মেয়েটার দেখাশুনা আদরযত্ন করে। রাজার সংসার—নলিনের অর্থের অভাব তো নেই। দাস-দাসী—চাকর-বাকরে বাড়ী-ভরা! সুতরাং বিজলীর সেবা-শুশ্রূষার যে অভাব হচ্ছে, এমন কথা বলতে পারি না। কিন্তু গোড়ায় র'য়েছে মস্তবড় গলদ! আসল অভাব যেখানে, তা কে ঘুচাবে বল?"

তড়িতা জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি আবার কবে যাবেন?"

নরেন্দ্র বলিল—"ভেবেছিলুম এ হপ্তায় আর যাব না, এখানে তিন চারটে শক্ত কেস্ হাতে রয়েছে। কিন্তু নলিন যখন জরুরী টেলিগ্রাফ করেছে, তখন বোধ করি গুরুতর কারণ ঘটেছে, কাজেই আজ রাত্রের গাড়ীতেই আমাকে যেতে হচ্ছে।"

উমা নতমুখে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে ?... একবারটি যেতে বড় সাধ হচ্ছে !"

নরেন্দ্র মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল—"এখন না, আগে আমি অবস্থাটা দেখে আসি, যদি তেমন তেমন দরকার বুঝি তো—তুমি শুধু একলা নও, তোমাদের দুজনকেই নিয়ে যেতে হয়তো বাধ্য হব।" বলিয়াই বাহির হইয়া গেল।

খপ্ করিয়া তড়িতার হাত ধরিয়া, বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাহা... মুখের পানে চাহিয়া উমা জিজ্ঞাসা করিল—"পারবে দিদি ?"

—অস্তায়মান সূর্য্যের শেষ আভার ন্যায় একটা ম্লান হাসি হাসিয়া, যথেষ্ট দৃঢ়তার সহিতই তড়িতা জবাব দিল—"তোদের কাছে থেকে এতদিন যে শিক্ষা পেয়েছি, তাতেও যদি না পারি তো, আমি তোর দিদি হবার যোগ্য নই উমা !"

———

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বিকালবেলা অনেকক্ষণ ধরিয়া বাহিরের মুক্ত বাতাসে মাথাটাকে কতকটা ঠাণ্ডা করিয়া লইয়া,—সন্ধ্যার সময়ে নলিন যখন গৃহে ফিরিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল, তখন সহসা—কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক থম্‌থমে ভাবে তাহার সর্ব্বাঙ্গ একেবার কণ্টকিত হইয়া উঠিল! সভয়ে ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে টেবিলের সম্মুখে গিয়া একখানা চেয়ারের উপর ধপ্‌ করিয়া সে বসিয়া পড়িল।

টেবিলের উপরে—বৃহৎ সেজের ভিতরে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল। কিন্তু নলিনের চোখের উপরে তাহা অত্যন্ত ম্লান হইয়া ঘরের কোণে কোণে ছায়াময় বিভীষিকার ছবি ফুটাইয়া তুলিতে লাগিল। সে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

নিঃশব্দে ভৃত্য আসিয়া চা দিয়া গেল। কলের পুতুলের মত নলিন তাহা তুলিয়া লইয়া এক চুমুক খাইল। হঠাৎ চার বছরের জোৎস্নাকুমারী ছুটিয়া আসিয়া তাহার কোলের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল—"বাবা ও বাবা—শীগ্‌গির এস, মা যেন কেমন করছে—"

আকস্মিক নাড়া পাইয়া খানিকটা গরম চা নলিনের গায়ের উপরেই পড়িয়া গেল। কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, এক নিশ্বাসে বাকীটুকু পান করিয়াই, সে মেয়েকে কোলে তুলিয়া লইয়া বাড়ীর ভিতরে ছুটিয়া গেল।

...একটা আশ্চর্য্যজনক পাণ্ডুবর্ণে বিজলীলতার সারা মুখখানি ছায়া গিয়াছিল। মাঝে মাঝে সেই মৃত্যুছায়া-মলিন মুখে এমন এক-একটা বিকৃত ভঙ্গিমা ফুটিয়া উঠিতেছিল যে, সেই চার বছরের শিশুও তাহাতে ভয় পাইয়া বাপের কাছে ছুটিয়া গিয়াছিল !

...সকালবেলা হইতেই বিজলীর পীড়ার বৃদ্ধি দেখিয়া, দুপুরবেলাতে নলিন যখন নরেন্দ্রকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাফ করিয়াছিল, তখনো ভাবিতে পারে নাই যে, একটা বেলার ভিতরে রোগিণীর অবস্থার এরূপ ভীতিজনক পরিবর্ত্তন ঘটিবে !... উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে নলিন বিজলীর শিয়রে বসিয়া নিঃশব্দে তাহার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল।

অসহ যাতনায় বিজলী কেবলই ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল! পীড়িতার মুখের পানে নীরবে চাহিতে চাহিতে সহসা নলিনের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল! গভীর স্নেহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"বড় কষ্ট হচ্ছে কি এখন ?"

বিজলী চম্‌কাইয়া ফিরিয়া ক্ষণকাল নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে পতির মুখের পানে নীরবে চাহিয়া রহিল। তারপরে ম্লানভাবে ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"এমন স্বর তোমার আর কখনো শুনিনি কেন ?" তার পর কিছুক্ষণ আন্‌মনা থাকিয়া কহিল—"যদি কিছুদিন আগে—" সহসা, থামিয়া একবার ঢোক গিলিয়া আবার বলিল—"এখন আর মিছে চেষ্টা !...ডাক পড়েছে জ্যোৎস্নাকে—দেখো—"

বিজলীর নিরাশাজড়িত ভগ্ন কণ্ঠস্বরে নলিনের বুকের ভিতরটাতে অত্যন্ত জোরে মোচড় দিল। কোন্ দূরদেশের নবাগতা ভীষণা নিয়তি তার নির্ম্মম হাত দিয়া এই হতভাগ্য যুবককে কেবলই আঘাতের পর আঘাত করিতেছিল! তার মনে হইল—বুঝি বা তাহারই অবজ্ঞার ফলে এ কুসুম অকালে ঝরিয়া পড়িতেছে !...কষ্টে চোখের জল থামাইয়া আশ্বাস দিয়া কহিল—"অমন ভয় পাচ্ছ কেন, সেদিন ডাক্তার-সাহেব এসেও তো

খুবই ভরসা দিয়ে গেছেন, আর নরেনও তো যা বলেছে—শুনেছ? তাকে আসবার জন্যে আজ দুপুরবেলায় টেলিগ্রাফ করে দিয়েছি।...সে নিশ্চয়ই কাল সকালে এসে পড়বে।"

বিজলী-চমকের মতই, আবার একটুখানি ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বিজলী-লতা কহিল—"ডাক্তারেরা ব্যামো সারাতে পারে, কিন্তু পরমায়ু তো বাড়িয়ে দিতে পারবে না?...তুমি আমার কাছে ঈশ্বরের শপথ কর, বল—জ্যোছনাকে অবহেলা করবে না?"

সহসা একটা অব্যক্ত যাতনায় বিজলীর মুখখানা এমন বিকৃত হইয়া উঠিল যে, নলিন ভয় পাইয়া, তাড়াতাড়ি পরিচারিকাদের ডাকিয়া কাছে বসিতে বলিয়াই—শশব্যস্তে স্থানীয় ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিতে ছুটিল।

বিজলী বিকৃত কণ্ঠে পরিচারিকাকে কহিল—"তোদের থাকতে হবে না যা—একবার—অমল-দিদিকে শীগগির ডেকে দে।"

বিজলীর এই প্রৌঢ়া জ্ঞাতি-ভগ্নীটি শেষ জীবনে,সকল আত্মজন হারাইয়া আসিয়া, তাহারই কাছে আশ্রয় লইয়াছিল। বিজলীলতাও অমল দিদির উপরে সংসারের এবং তনয়ার সকল ভার অর্পণ করিয়া দিয়া যেমন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত, তেমন নলিনের উপর দিয়াও পারিত না। পরিচারিকার মুখে বিজলীর আহ্বান শুনিয়া, রন্ধনশালা হইতে ছুটিয়া আসিয়া অমলা সভয়ে প্রশ্ন করিল—"কেন্ রে বিজু—কি হয়েছে, হঠাৎ ডেকে পাঠিয়েছিলি?...অসুখ বেশী মনে হচ্ছে?"

বিজলী হাঁফাইতে হাঁফাইতে অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে জবাব করিল—"না, কিন্তু আমার বড় ভাবনা হচ্ছে—অমলদি!...যদি আজ—যদি কেন, যখন সময় হ'য়েছে তখন তো মরবোই,...তাতেও ভয় করিনে!...কিন্তু খুকী—আমার জ্যোছনা—" বলিতে বলিতে হঠাৎ মুখ মচ্‌কাইয়া, মুহূর্ত্তকাল নীরব হইয়া রহিল, তারপরে পুনরায় কহিল—"অমল-দি, একটু শীগ্‌গির করে

হাতের কাজ চুকিয়ে এসে আমার কাছে বোস, আজ আমার যেন কেমন ভয়-ভয় করছে।...একলা থাক্‌তে মোটেই সাহস হচ্ছে না।"

মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, মায়ের মত গভীর স্নেহের স্বরে অমল-দিদি ভরসা দিয়া বলিল—"ভয় কি দিদি, নলিনবাবু ডাক্তার ডাকতে নিজে ছুটে গেছেন—এক্ষুণি আসবেন, আর নরেনবাবুকেও আসবার জন্যে আজ দুপুরবেলা 'তার' করা হয়েছে।...তুই একটুও ভাবনা করিসনি!...অসুখ তো দুনিয়া শুদ্ধ লোকেরই হয়, সে জন্যে ভয় কি?"

ঈষৎ ব্যথার হাসি হাসিয়া বিজলী বলিল—"ভয়, ভরসা, সাহস, সব কিছুরই সঙ্গে আমার পরিচয় কমে এসেছে দিদি! কেবল মেয়েটার ভবিষ্যৎ ভেবেই আমার মরণে শান্তি নেই!"

মায়ের বিছানার একধারে পড়িয়া, জ্যোৎস্না নীরবে কেবলই দুইহাতে চোক রগ্‌ড়াইতেছিল। অমলা চলিয়া যাইতেই বিজলী তাহাকে ডাকিয়া বুকের উপর টানিয়া লইয়া, ছলছল চোখে নীরবে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। জ্যোৎস্না, মায়ের চোখে জল দেখিতে পারিত না। কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কাঁদছো কেন মা?"

আস্তে আস্তে মেয়ের মুখখানি টানিয়া লইয়া চুম্বন করিয়া বিজলী কহিল—"আমি চল্লুম রে জ্যোছনা।" বলিয়াই অন্তরের দাবিয়া রাখা বেদনাটুকু আরও জোরে চাপিবার চেষ্টা করিল।

জ্যোৎস্না কাঁদ কাঁদ ভাবে কহিল—"কোথায় মা?"

—"সে—অনেক—অনেক দূর মা!"

—"কেন যাচ্ছো মা?..."

—"যাবার সময় হয়েছে যে মা—আর কি না গেলে চলে?"

—"আবার কখন আস্‌বে?"

—"আবার আস্‌বো?..." একটু অন্যমনস্ক থাকিয়া, কি ভাবিতে-ভাবিতে

দৃঢ়স্বরে বিজলী পুনর্ব্বার কহিল—"হ্যাঁ মা—আসবো, আবার আসবো বই কি ! তোকে ফেলে গিয়ে কি চুপ করে থাক্‌তে পারি ?···আবার তোকে দেখতে আসবো মা—"

ইহারই মধ্যে সহসা অমলা ঘরে ঢুকিয়া বলিল—"এই নে বিজু—এই সুপ্‌টুকু খেয়ে ফেল্ দেখি—"

কিন্তু বিজলী হাত দিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া অত্যন্ত বিরক্ত স্বরে কহিল—"ফেলে দাও...আর কেন জ্বালাও দিদি ? দেখ্‌ছো না—হয়ে এলো যে—···ওপারের ডাকাডাকি এ পারের সীমানায় পৌঁছে গেছে !...মিছে তোমার সুপ্ খাওয়ানো—"

অমলা সুপের গেলাস ফেলিয়া—চোখে কাপড় চাপিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিজলী মৃদুস্বরে কহিল—"ছিঃ দিদি—কেঁদো না, কাছে এস—এ সময়ে চোখের জল ফেলো না।...মস্ত ভার তোমার উপর চাপিয়ে যাচ্ছি, নইলে—আমার যে আর কেউ কোথাও নেই।"

বিজলীর দীপ্তিহীন চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসিল। অমলা ধীরে ধীরে মুছাইতে মুছাইতে বলিল—"ছিঃ বোন—হতাশ হচ্ছ কেন, আবার সেরে উঠ্‌বে।"

—"কোন্ সুখের আশায় দিদি ?...এখনও তুমি আমায় বেঁচে থাক্‌তে বল ?" বলিয়া বিজলী ধীরে ধীরে একটা উষ্ণ নিশ্বাস ছাড়িয়া দিল, তারপরে, সহসা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—"না দিদি—বোঝনা তুমি, আমার যাওয়াই মঙ্গল। জ্যোছনাকে তোমায় দিয়ে গেলুম দিদি, দেখো—"

কথা ধরিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে দুচোখ ছাপাইয়া প্রবল অশ্রুর ধারা গণ্ড বহিয়া ছুটিল।

জ্যোৎস্না আকুল হইয়া বলিল—"মা—মা—ওমা ! যেওনা মা ! আমি যে তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে পারবো না মা !"

২১।১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

—"আবার আসবো রে পাগলি! আবার আসবো!—কান্না কিসের—ছিঃ! লোকে যে নিন্দে করবে?"

বলিতে বলিতে বিজলী চোখ মুছিয়া জ্যোৎস্নার মুখ চুম্বন করিল। তারপরে তাহার হাত দুখানি লইয়া অমলার হাতের উপরে রাখিয়া বলিল—"এ ভার নিলে তো দিদি?

অমলা রুদ্ধকণ্ঠে কোন রকমে জবাব দিল—"নিলুম বোন।"

তারপর মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিয়া, জ্যোৎস্নাকে কোলে তুলিয়া লইয়া ঘন ঘন চুম্বন করিল।

বিজলী একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আঃ—এখন নিশ্চিন্ত...আর কোথাও বাধা নেই!"

* * * নলিন ডাক্তার লইয়া উপস্থিত হইল। যথাশক্তি পরীক্ষা করিবার পরে ডাক্তার একটা প্রেস্‌ক্রিপশন্ করিয়া দিয়া বলিয়া গেল—"আপনি যতটা মন্দ ভাবছেন, তা এখনো হয় নি। এই ওষুধটার দাগ দুই খাওয়ালেই অনেকখানি সাম্‌লে নিতে পারবেন।"

কিন্তু আত্মীয় পরিজনের দুর্ভাগ্য বশতঃ সে রাত্রি আর কাটিল না। ভোরের বেলা, প্রথম ঊষার রক্তরাগের ভিতর দিয়া—পাখীর প্রথম কাকলীর আহ্বানে বিজলীর প্রাণ পাখীটীও উড়িয়া—কে জানে—কোন্ অজ্ঞাত রাজ্যের অভিমুখে অদৃশ্য হইয়া গেল!...

......রাত্রের গাড়ীতে আসিয়া—অতি প্রত্যূষে নরেন্দ্র যখন সেখানে উপস্থিত হইল, তখন স্তব্ধ নলিনের ক্রোড়ে—মৃতা জননীর বুকের উপরে শুভ্র কোমল হাত দুখানি রাখিয়া সদ্য মাতৃহারা বালিকা—জ্যোৎস্না ঘুমাইয়া পড়িয়াছে!...সুপ্তির মোহন-মন্ত্রের মহিমায়, বেচারী ক্ষুদ্র শিশু ভুলিয়া গিয়াছে যে,—আজ তার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৌস্তূভমণি—তাহাকে ফাঁকি দিয়া জন্মের মতই হারাইয়া গিয়াছে!

নরেন—গম্ভীর অথচ ক্ষুন্নকণ্ঠে ডাকিল—"নলিন !"

নলিন উদাস মুখখানা ধীরে ধীরে তুলিয়া নরেনের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল, তারপর শুষ্ক চোখ দুইটা সহসা জ্যোৎস্নার দিকে ফিরাইয়া লইয়া, অভাগিনী কন্যাকে বুকের খুব কাছে টানিয়া ধরিল !

নরেন্দ্রনাথ ভাবিল—কত ব্যথা আর সৌন্দর্য্যের অসীম আলো এবং সান্ত্বনা ছড়ানো আছে—এই মায়া এবং স্নেহের গুপ্ত ভাণ্ডারে !

২।১।১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মৃতার প্রতি পৃথিবীর মানুষের যত প্রকার কর্ত্তব্য আছে, সে সমস্তই এক এক করিয়া শেষ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই শোক-দুঃখ কমিয়া আসিল—রোদন নীরব হইল। এমন কি অমলারও ক্রন্দন থামিয়া গেল। কিন্তু কান্না ফুরাইল না কেবল একটি প্রাণীর—সে চার বছরের বালিকা জ্যোৎস্নাকুমারী!...আহা—মা-হারা বেচারী!

—"মা যে আসবে বলে গেছে—কখন আসবে বাবা?"

বলিয়া, বালিকা সেই যে কাঁদিয়া লুটাইতে আরম্ভ করিল, কেউ আর কোন রকম প্রবোধ দিয়া কিছুতেই তাহাকে থামাইতে পারিল না। মাসের পর মাস কাটিয়া চলিল, সংসার যেমন চলিতেছিল আবার তেমনি চলিতে লাগিল, স্মৃতির পাতে একটি ক্ষীণ আঁচড়ের দাগ মাত্র রাখিয়া মৃতার সকল কথাই সকলের হৃদয় হইতে লুপ্ত হইয়া গেল; কেবল একটি ক্ষুদ্র বালিকাকে তাহার জননী অন্তিম নিশ্বাসের সহিত যে আশ্বাস দিয়া গিয়াছিলেন, সে তাহা ভুলিতে তো পারিলই না, অধিকন্তু সেই আশ্বাসবাক্যে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার পুনরাগমনের প্রতীক্ষায়—দিবারাত্রি কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের চোখ দুটোকে একেবারে অন্ধ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়া তুলিল।

দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত ধারা বহিতে বহিতে ক্রমেই জ্যোৎস্নার চক্ষু দুটি প্রকৃতই দীপ্তিহীন হইয়া দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। তবুও একদিকে

বালিকার চোখে জল ঝরার যেমন কামাই রহিল না, অন্যদিকেও তেমনি শিশুর বিশ্বাসভরা সরল প্রাণে তাহার মৃতা-জননীর আশ্বাসবাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং নির্ভরও শতগুণে প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। সংসারের সহস্র কর্ম্ম-কোলাহলের ভিতর দিয়া নলিনের কানে কেবলই ধ্বনিত হইতে লাগিল—পড়া-পাখীর মত—শিশুর সেই একই বুলি—

—"মা যে আসবে বলে গেছে—কখন আসবে বাবা ?"

নলিন স্তম্ভিত হইয়া গেল ! কমলবাসিনী কত চেষ্টা—কত চতুরতা—কত বুদ্ধিকৌশলে প্রাণপাত আয়াস স্বীকার করিয়াও, যে ডোরে বাঁধিয়া পুত্রকে গৃহবাসী করিবার চেষ্টায় কেবল নিষ্ফলতা বই আর কিছুই অর্জ্জন করিয়া যাইতে পারেন নাই, আজ এই অজ্ঞান শিশু তার চেয়ে শতগুণে ক্ষীণ ডুরীতে, ততোধিক কঠিন ভাবে নলিনকে বাঁধিয়া সংসারের ভিতর একেবারে বন্দী করিয়া, পিতামহীর ঋণ সুদে-আসলে উসুল করিরা লইতে ছাড়ে না !

—তা ছাড়া সব চেয়ে বিপদের কথা হইল এই যে,—জ্যোৎস্নার শিশু-হৃদয়ের সেই অগাধ বিশ্বাসকে কেহই বিন্দুমাত্রও টলাইতে পারিল না, বরং সেই চেষ্টার জন্য যে যতই নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল, ততই জ্যোৎস্নার হৃদয়ে তাহার মাতার বাক্যের প্রতি বিশ্বাস আরো অধিকতর বদ্ধমূল হইয়া, শুধুই যে তাহার আকুলতা বাড়াইল এবং চোখের জল টানিয়া বাহির করিতে লাগিল এমন নয়, আর একটা বিষম ব্যাপারের সূচনা করিয়া দিল !

—পাছে তাহার জননী ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে দেখিতে না পাইয়া চলিয়া যায়, এই ভয়ে—জ্যোৎস্না আর তাহার মায়ের ঘরখানি ছাড়িয়া এক পাও বাহির হইতে চাহিল না।

কাঁদিতে কাঁদিতে—কেবলই নলিনকে আকুল করিয়া জিজ্ঞাসা

করিতে লাগিল—"মা যে আসবে বলে গেছে—কখন আসবে বাবা ?"

নলিন বিব্রত হইয়া পড়িল। চোখের চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ নরেন্দ্র, জ্যোৎস্নার অবস্থা প্রথমাবধি লক্ষ্য করিয়া একটা আশঙ্কাজনক ভবিষ্যদ্বাণী শুনাইয়া বালিকাকে যে ভাবে রাখিবার জন্য নলিনকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিল, স্নেহের অনুরোধে নলিন যখন তাহা পালন করিতে সক্ষম হইল না, তখন ক্রমাগত ধারা গড়াইতে গড়াইতে, জ্যোৎস্নার দুটি চোখের তারার উপরে দু'খানি অতি সূক্ষ্ম আবরণ পড়িতে আরম্ভ করিল এবং ইহার জন্য তার দৃষ্টিশক্তি স্বল্প হইয়া গেল! কিন্তু তবুও তাহার রোদন থামিল না! জ্যোৎস্না আর চোখে দেখিতে পায় না, অন্ধের মত—পিতার দিকে হাত দুখানি বাড়াইয়া—কেবলই কাঁদিয়া কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করে—

—"মা যে আসবে বলে গেছে—কখন আসবে বাবা ?"

দুচার দিনের মধ্যে জ্যোৎস্নার চোখের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া নরেন্দ্র আসিয়া প্রমাদ গণিল, এবং নলিনকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া, পরের গাড়ীতেই কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। আজ নলিন একটাও জবাব করিতে পারিল না। বন্ধুর সকল ভর্ৎসনা নীরবে সহ্য করিয়া গেল,...আজ মৃতের মত স্তব্ধ থাকিয়া বোধ করি বা স্বর্গগতা বিজলীর কথাই চিন্তা করিতে লাগিল!

পরদিন মেডিকেল কলেজের বড় সাহেব-ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া, নরেন্দ্র যখন পুনরায় নলিনের গৃহে উপস্থিত হইল, তখন উভয়েই আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে—এই ঘরখানির ভিতরে রোরুদ্যমানা কন্যাকে কোলে লইয়া নলিন তেমনি জড়ের মত উপবিষ্ট রহিয়াছে! দুজনেরই চোখের ধারা একত্র মিশিয়া স্রোতের মত হুহু বহিয়া চলিয়াছে!

জ্যোৎস্নার চোখ দুটি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া, স্বহস্তে ব্যাণ্ডেজ

বাঁধিয়া দিয়া সাহেব কহিলেন—"এ বালিকাকে এখন কিছুদিনের জন্য এমনি বাঁধা-চোখে সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরের ভিতরে রাখ্‌তে হবে। উপস্থিত সপ্তাহে দু'দিন করে—সেই ঘরের ভিতরেই সবুজবর্ণের আলোতে ব্যাণ্ডেজ খুলে, চোখ ধুয়ে, ওষুধ দিয়ে—আবার তৎক্ষণাৎ বেঁধে রাখতে হবে। বিশেষ নৈপুণ্য ও সতর্কতার আবশ্যক—এ কথা বোধ করি আর তোমাকে বলবার আবশ্যক করে না নরেন!...তুমি এসে, স্বহস্তে এ ব্যবস্থা করবে। খুব সাবধান! কোন রকমে অতি সূক্ষ্ম আলোর ছটাও যেন ওর চোখে না লাগে। তা'হলে বালিকা দৃষ্টি-শক্তি আর ফিরে পাবে না।"

ডাক্তার-সাহেব বিদায় হইবার পরে, নরেন্দ্র যখন তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী কক্ষের বন্দোবস্ত করিতে লাগিল, তখন নলিন তাহার হাত দুখানি ধরিয়া, সহসা আকুল হইয়া কহিল—"এখন উপায়?...আমি যে ধনে-প্রাণে গেলুম ভাই!"

নরেন্দ্র জবাব না করিয়া—কেবলমাত্র জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল। নলিন তিনখানা খাম দেখাইয়া কহিল,—"ম্যানেজারের কাছ থেকে এই হপ্তার ভিতরে উপর্য্যুপরি এই তিনখানা জরুরী টেলিগ্রাফ এসেছে—পড়ে দেখ!...মহা গোলমাল বেধেছে সেখানে।...চার-পাঁচটা বড় বড় কাজ হাতছাড়া হয়ে গেছে, তার উপর চুরির তো অন্ত নেই। এখন কলকাতায় গিয়ে অন্ততঃপক্ষে মাসখানেক দিবারাত্রি স্বয়ং হাজির থাকতে না পারলে সব যাবে—একেবারে পথে বসতে হবে আমাকে!...তোরও যে ভাই সেখানে নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই জানি, এখানে এসে পড়ে থাকতেও বলতে পারি নি তোকে, এ অবস্থায় আমার জ্যোছনার ভার কার উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যাব, আজ সেই কথাটাই আমাকে বুঝিয়ে বল্ নরেন!"

নলিন এমন হতাশভাবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল যে, নরেন্দ্র একটু না হাসিয়া থাকিতে পারিল না, কহিল—"বড় দুঃখে আজ হাসি এলো নলিন!...তোর আর মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না দূর হয়ে যা—আমার সাম্‌নে থেকে।...হতভাগা কোথাকার—মনুষ্যত্ব হারিয়েছিস্—সব ভুলে গেছিস্? তুই আর তোর মেয়ে কি আমার কেউ নয় যে, তুই আজ এমন করে, ...যা—যা—দূর হয়ে যা আমার সুমুখ থেকে।" বলিতে বলিতে নরেনের গলার স্বর ভারি হইয়া আসিল। তাহার দুটি চোখ জলে ভরিয়া উঠিল!

মুহূর্ত্তকাল নীরব নিস্পন্দভাবে বন্ধুর প্রশান্ত মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া, সহসা নলিন উদ্‌ভ্রান্তভাবে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া, উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল,—"সত্যই ভাই হতভাগা আমি! স্বর্গের দেবতা যে তুই—তা আমি ভুলে গিয়েছিলুম নরেন!...তোর চোখের জলে ধুয়ে, আমাকে আবার তেমনি সরল—তেমনি পবিত্র করে নে ভাই!"

চোখ্ মুছিয়া, ভরসা দিয়া নরেন্দ্র কহিল,—"তুই স্বচ্ছন্দে কলকাতায় গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে তোর বিষয়-কর্ম্ম দেখ্‌গে যা। আমি আবার পরশু ভোরেই একজন শিক্ষিত—উপযুক্ত নার্স সঙ্গে করে এনে, যেমন ভা[illegible] বুঝবো ব্যবস্থা করবো। ভাবিস্‌নি,...জ্যোছ্‌না শুধু তোর এ[illegible]ারে নয়।"

—"আর লজ্জা দিস কেন ভাই?" বলিয়া, নলিন উৎসাহ ভরে কহিল —"আজ রাত্রের গাড়ীতেই আমি কলকাতায় চলে যাব...অন্ততঃ মাস দুই আমার হয়তো ফেরাই চলবে না।"

—"না চলুক—ক্ষতি কি? নিশ্চিন্ত হয়ে সেখানে তুই তোর আফিস-টাকে manage করে নে।...কিন্তু আজ না—কাল রাত্রের গাড়ীতে যাস্,

কারণ পরশু ভোরের আগে আমরা এসে পৌঁছুতে পারবো না।" বলিয়া নরেন্দ্র অন্ধকার কক্ষের সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, বিকালের গাড়ীতেই চলিয়া গেল। একটা দিন পরে সকাল বেলাতেই আবার যখন সে একজন নার্সকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন নলিন প্রায় শিয়ালদহের কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিয়াছে, এবং কৃত্রিম অন্ধকার ঘরের মধ্যে অর্দ্ধনষ্ট চক্ষুদুটির নীচে হাত রাখিয়া, জননী-শোক-সন্তপ্তা জ্যোৎস্না, করুণ বেদনায় লুটাইয়া পড়িয়া আছে !

———

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

কেবল সকালবেলা! পল্লীগ্রামের শ্যামলতার বুকে ম্লান-সূর্য্যের নব আভা সোহাগে লুটাইতেছিল! অদূরে নিবিড় বনানির মৃদু কোলাহলকে ছাপাইয়া দেয়েল্-শ্যামার আবাহন গান ভাসিয়া আসিতেছিল—দরদীর অন্তরের অন্তঃপুরে!...নরেন্দ্র নাথ তড়িতাকে লইয়া বাড়ী ঢুকিল!...তড়িতার বুক দুরু দুরু কাঁপিয়া জানাইল—উঃ কতকাল পরে!

অমলা সহসা নার্সটিকে দেখিয়াই ঠিক ভূতগ্রস্তের মত একেবারে আড়ষ্ট হইয়া, নির্ব্বাক বিস্ময়ে, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া এক দৃষ্টে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল!

অধরকোণে মধুর হাসি ফুটাইয়া তুলিয়া, ততোধিক মধুর স্বরে নব আগন্তুক ধাত্রী প্রশ্ন করিল—"আপনি হঠাৎ ও রকম অবাক হয়ে এক দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে দেখছেন কি?"

কিন্তু অমলা লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক—বরং অধিকতর হতভম্ব হইয়া, সে প্রশ্নের জবাব করিতে পারিল না। থতমত খাইয়া, ইতস্ততঃ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল—"কিছু মনে করবেন না,...আপনার নামটি কি জিজ্ঞেস্ করতে চাচ্ছিলুম—"

—"মিস্ বাসন্তীলতা মিত্র,...কেন বলুন দেখি?...আপনার ভাব দেখে মনে হয়,— যেন আচম্বিতে কি একটা আশ্চর্য্য রহস্যের মাঝখানে পড়ে গেছেন!"

অমলা গম্ভীর হইয়া কহিল—"আশ্চর্য্যই বটে! এ যেন স্বপ্নের কথা!" যেন নিজের মনেই মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল—'ঠিক সেই চেহারা—হুবহু,... ধাঁজ, গড়ন, রং, চাউনি—মায় গলার স্বরটুকু অবধি ঠিক সেই রকম...অথচ তাকে নিজের হাতে বিদেয় ক'রে দিয়েছি!...এমন জায়গায় চ'লে গেছে,—যেখানে গেলে আর ফিরে আসা যায় না।"

সহসা নার্সের হাতের রুমালখানা মাটীতে পড়িয়া গেল। মুখ নীচু করিয়া কুড়াইতে কুড়াইতে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কার কথা বলছেন?"

—"এই বাড়ীর মৃতা কর্ত্রীর।—যার মেয়ের ভার নিতে এসেছেন আপনি।...মাস কয়েক হল সে মারা গেছে, কিন্তু আপনাকে দেখলে কেউ সেকথা বিশ্বাস করবে না।"

—"তার মানে?...তিনি কি ঠিক আমারই মত দেখ্‌তে ছিলেন?" বলিয়াই সহসা উদ্গত দীর্ঘ নিশ্বাস চাপিয়া আহ্লাদের হাসি হাসিয়া বাসন্তী-লতা কহিল,—"কিন্তু আপনার অতিরিক্ত সৌজন্য, ও বিনয়ের কথায়, আমি ধন্য হলুম। তবুও ঈশ্বরের রাজ্যে এ রকম সাদৃশ্য দু-একটা যে নেই—এমনও নয়।"

—"হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বলছি—একেবারে এমন হুবহু সাদৃশ্য দেখে বাইরের লোক কেউ তার মৃত্যুর কথা সহসা বিশ্বাস করিতে চাইবে না।"

বাসন্তীলতা আবার হাসিয়া কহিল—"বিশ্বাস না করে তো আমারই লাভ অধিক, আর আশা করি আপনারও তাতে লোকসান নাই।...এখন চলুন মেয়েটীকে আগে দেখি গিয়ে।"

নলিনের সেই আগেকার ছোট বাড়ী আর ছিল না, বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়া, গঠনে এবং সাজসরঞ্জামে ধনকুবেরের আবাসের উপযোগী হইয়া উঠিয়াছিল। তবুও সেই পুরাতন দিনের যে সকল আসবাব্ প্রভৃতি ছিল,

তাহা নজরে পড়িতেই সহসা বাসন্তীর সারা হৃদয় মথিত করিয়া স্মৃতির সাগর উথলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিষাদের অবসন্নতায় তাহার সমস্ত দেহটা যেন শিথিল—অবশ হইয়া পড়িল।

সিঁড়ি বাহিয়া দোতলায় উঠিয়া, উপর্য্যুপরি দুইটি ঘরের ভিতর দিয়া লইয়া গিয়া,—অমলা যখন তাহাকে জ্যোৎস্নার অন্ধকার কক্ষের ভিতর দাঁড় করাইয়া দিল, তখন সেখানকার সেই অস্বাভাবিক অতি মৃদু আলোকে বাসন্তীর নিজের চোখের উপরেই যেন একটা আবরণ পড়িয়া আসিতেছে মনে হইল! ঘরের সমস্ত দরজা জানালাগুলির উপরেই গাঢ় সবুজ বর্ণের বনাতের পর্দ্দাগুলো এমন মোটা করিয়া টাঙানো যে, ঘরের মাঝখানে একটা কাল পাথরের টেবিলের উপরে—গাঢ় সবুজ বর্ণের ফানুসে ঢাকা—অত্যন্ত স্নিগ্ধ, অত্যন্ত মিটমিটে একটা সেজের আলোতে, বাসন্তীর চোখে কেবল অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই ঠেকিল না।...জ্যোৎস্না তখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! সহসা সর্ব্বাঙ্গ স্পন্দিত করিয়া যেন বাসন্তীলতার চেতনা ফিরিয়া আসিল! চঞ্চল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কই—মেয়ে কোথায়?"

—"ওই যে—ওখানে—খাটের উপরে শুয়ে।"

অমলা অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দেখাইয়া দিল। কিন্তু তাহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই, ধড়্মড়্ করিয়া জ্যোৎস্না ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল—"ওমা—এই যে এখানে রয়েছি!"...তারপর অভিমানক্ষুব্ধ হইয়া ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল—"তুমি ভারি দুষ্টু! ওঃ এত দেরী ক'রলে—"

অমলা জ্যোৎস্নাকে কোলে তুলিয়া লইতে গেলে, সে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া, অধীর হইয়া বলিল,—"না না, তুমি যাও মাসিমা—এই যে মার কথা শুনলুম—এক্ষুনি!...ওমা—মা—মাগো—কই—?"...বলিয়াই ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল!

অমলা আর চোখের জল ধরিয়া রাখিতে পারিল না, নার্সের গা টিপিয়া কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল—"ওই শোন বোন, তোমার গলার স্বর শুনে শুধু আমি না—"

জ্যোৎস্না অধীর আগ্রহে ছট্‌ফট্ করিতে করিতে আবার বলিয়া উঠিল—"কই মা কোথায় মা!—আর আমাকে ফেলে যেয়োনা মা, আর আমি দুষ্টুমী করবোনা মা!"

বাসন্তী আর থাকিতে পারিল না। তাহার হৃদয়ের সপ্ততল ভেদ করিয়া, সহসা একটা অননুভূতপূর্ব্ব স্নেহের প্রবাহ ওতপ্রেত হইয়া ঠেলিয়া উঠিল। ততক্ষণে তাহার চোখের দৃষ্টিও অন্ধকারে অভ্যস্ত হইয়া অসিতে-ছিল। তাড়াতাড়ি খাটের কাছে যাইতে যাইতে বলিল—"এই যে মা! আমি আস্‌ছি।...জ্যোৎস্না মা আমার!"

আহ্লাদের আতিশয্যে জ্যোৎস্না বলিয়া উঠিল—"হুঁহুঁ তবে নাকি মাসীমা বাবা সবাই বলে—আর তুমি আসবেনা!—সেখানে গেলে নাকি আসা চলে না!"—বলিয়াই চোখের ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া ফেলিতে গেল।

—"খুলোনা—খুলোনা" বলিয়া বাধা দিয়াই, শশব্যস্তে বাসন্তী তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া স্নেহভরে মুখচুম্বন করিল। জ্যোৎস্না আহ্লাদে আটখানা হইয়া দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অভিমানে ফুলিতে ফুলিতে কহিল—"নাঃ আর আমি এটাকে চোখে রাখ্‌তে দেবনা মা! কতকাল তোমায় দেখিনি বল দেখি,...ওটাকে এক্ষুনি খুলে দাওনা মা?"

সহসা এমন একটা পবিত্র স্বর্গীয় সুধার প্রবাহে বাসন্তীর সারা হৃদয়খানি ভরিয়া উঠিল যে, কাঙ্গাল পথের ধূলায় অমূল্য রত্ন কুড়াইয়া পাইলে যেমন করিয়া বুকের ভিতরে সন্তর্পণে লুকাইয়া রাখিতে চাহে, তেমনি করিয়া ঐকান্তিক আবেগের আতিশয্যে শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া, পুনঃ পুনঃ তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিল! কহিল—"ছিঃ মা, অত অস্থির হ'য়ো

না !...ডাক্তার এলে তোমার চোখের বাঁধন খুলে দিতে বলবো'খন। ডাক্তারের কথা শুন্‌তে হয় !...তুমি যে আমার লক্ষ্মী মেয়ে—”

অভিমান ভরে মুখখানি ভার করিয়া জ্যোৎস্না কহিল—“হুঁঃ—আমার মতন তো তোমার মন কেমন করেনা কি না, তাহলে এক্ষুণি খুলে দিতে !”

এই অম্লান শিশুহৃদয়খানি হৃদয়ের সংস্পর্শে আনিয়া, বাসন্তীর সারা জীবনের সকল ব্যর্থতা—সকল দৈন্য যেন মুহূর্ত্তের ভিতরেই সার্থকতায় ভরিয়া গিয়া এমন শান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ করিল যে, সকল বাধা-বিঘ্ন-পার্থক্য হেলায় দলিত করিয়া, তাহার সমস্ত মনটুকু নিখিল বিশ্বের সঙ্গে এক মহান উচ্চ সুরে—এক তারে গাঁথা হইয়া গেল !...সে যেন আজ কত ঝড় তুফান সহ্য করার পর, পরের ভিতরে হৃদয় ডুবাইয়া, বিশ্বের হৃদয়কে নিজের ভিতরে কুড়াইয়া পাইল।...বিহ্বল সুখে আত্মহারা হইয়া একশো-বার চুমা খাইতে খাইতে বালিকার কচি মুখখানি রাঙা করিয়া কহিল—“এই যে তুমি আমার বুকের ধন বুকে রয়েছ, দুঃখ কিসের যাদু ? চোখের বাঁধন খুলে দেবো'খন মা, কিন্তু আজ নয়—কাল।”

এমনি করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রাণীটি, মুহূর্ত্তের ভিতরেই যে কি কুহক-বলে বাসন্তীর সারা হৃদয়খানিকে মধুর মাতৃস্নেহে সুধাসিঞ্চিত করিয়া—অটুট—অক্ষয় ডুরিতে বাঁধিয়া চিরবন্দিনী করিয়া ফেলিল, তাহা সেই সেবা-ধারিণী বুঝিতে পারিল না। শুধু এইটুকু মাত্র তাহার অনুভব শক্তি রহিল যে, এই ধ্রুব তারাটির উপরে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, এখন হইতে সে অকূল বারিধির তরঙ্গ-সঙ্কুল বক্ষেও অনায়াসে বুক ফুলাইয়া চলিয়া যাইতে পারিবে !...

অনেকক্ষণ ধরিয়া জ্যোৎস্নাকে কোলে করিয়া—গল্প করিয়া—আদর করিয়া—খাওয়াইয়া—ঘুম পাড়াইয়া—বাসন্তী যখন স্নানাহার করিবার জন্য পা টিপিয়া-টিপিয়া বাহিরে আসিল, তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে !

অমলা তাহার প্রতীক্ষায় দোরগোড়াতে দাঁড়াইয়া ছিল, দেখিয়াই বলিল—“পরের কাজে প্রাণপণে খাটতে এসে, শেষে কি নিজের প্রাণটুকু দিয়ে যাবে বোন? সময় মত স্নানাহার এবং নিজের দেহের উপর দৃষ্টি না রাখলে নিজে যে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়ে পড়বে!...দেখ দেখি—বেলা যে গড়িয়ে এলো! এ বাড়ীতে পা দিয়েই সেই যে রোগীর ঘরে ঢুকেছ, এখনও কি একটু আহার-বিশ্রামের সময় হল না?”

বাসন্তী মুগ্ধ ভাবে হাসিয়া কি জবাব করিতে যাইতেছিল, সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া,—ঘরের ভিতর হইতে জ্যোৎস্না কাতর স্বরে ডাকিয়া উঠিল—“ওমা—মা—কোথায় গেলে মা—মাগো—”

বাসন্তী চম্‌কাইয়া উঠিয়া—অধীর কণ্ঠে কহিল—“না দিদি—মেয়ে উঠেছে, তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে বিশ্রাম কর গিয়ে। আমি আর খাবনা—ক্ষিদে-তেষ্টা মোটেই নেই।”

বলিতে বলিতে আর উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই অমলার বিস্মিত চোখের উপরে, বাসন্তী ঝড়ের মত ছুটিয়া গিয়া জ্যোৎস্নার ঘরের ভিতরে ঢুকিল।......

* * * সপ্তাহখানেক পরে, চোখের ব্যাণ্ডেজ খুলিবার অধীরতায় জ্যোৎস্নাকে যখন আর কিছুতেই থামাইয়া রাখিতে পারা গেল না, তখন বাসন্তীর কাতর অনুরোধে বাধ্য হইয়া নরেন্দ্র, শিশুর চোখের ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—“তুমি কি যাদু জান তড়ি—”

লাজনম্রা বধূটির মতই তড়িতার পুলকমাখা মুখখানি নমিত হইয়া গেল!...ধীরে ধীরে কহিল—“চিকিৎসার গুণেই সেরে গেছে,...কিন্তু হঠাৎ—ওনামে ডাকলেন যে?—কি কথা ছিল?”

—“তুমি সত্যই যাদু জান বাসন্তি! যে আরোগ্যের সম্ভাবনা আরো দু’-

মাসের ভিতর আশা করিনি, তা—তুমি শুশ্রূষার ভার হাতে নিয়ে—সপ্তাহের ভিতরেই কেমন করে সম্ভব করে তুল্লে?...চিকিৎসায় এতটুকু ফল হয় নি বাসন্তী; শুশ্রূষার গুণেই আরাম হ'য়েছে। আর কোন ভয় নেই—বেশ সেরে গেছে। এখন ব্যাণ্ডেজ খুলে রাখা যেতে পারে। কিন্তু খালি-চোখে ক্রমে ক্রমে একটু একটু করে আলো সইয়ে সইয়ে তবে ঘর থেকে বার করতে হবে। আমি আজ কলকাতায় ফিরে গিয়ে, সর্ব্বাগ্রে নলিনকে এ সুখবর না দিয়ে বাড়ী যাব না। সে অন্ততঃপক্ষে—একটা দিনের জন্যও এসে দেখে যাক্। আহা বেচারা বড়—"

কথা ফুরাইল না, বাধা দিয়া বাসন্তী কহিল—"কিন্তু—তার আগে একটা কথার জবাব দিন,—বামুন ঠাকুর দেশ থেকে ফিরে এসেছে?"

নরেন্দ্র হাসিল, বলিল—"এসেছে। অনবরত চিঠির উপর চিঠি গিয়ে যে রকম তাকে বিরক্ত করে তুলেছিল, তাতে কি আর বেচারা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরের ভাত খেতে পারে?...কাল বিকালে এসে পৌঁছেচে।"

—"তা'হলে একবার উমাকে—"

বাসন্তী থামিয়া গিয়া মিনতির চোখে চাহিল। নরেন্দ্র আবার হাসি[illegible] বলিল—"তাকে কি এখনি আনতে বল?"

—"হ্যাঁ—আপনার বন্ধু বাড়ী আসবার আগেই তাকে আস্‌তে বলি। জানেন তো—সে তখনি আসবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, কেবল আপনার কষ্ট হবে বলেই—"

—"খুব জানি, সে তো পা বাড়িয়েই আছে—দাদার বাড়ী আসবার জন্যে—"

সহসা বাধা দিয়া, জ্যোৎস্না জিজ্ঞাসা করিল—"কে আসবে মা?"

নরেন্দ্র, তাহার মুখের পানে চাহিয়া ম্লানভাবে ঈষৎ হাসিল। কিন্তু

বাসন্তী তাহাকে আদর করিয়া চুমো খাইয়া কহিল,—"তোমার পিসীমা, তাকে দেখনি তো ?"

—"না, খালি মাসীমাকে দেখিছি...পিসীমা কবে আসবে মা ? আমি দেখ্‌বো—"

—"দেখবে বই কি ! পিসীমাকেও দেখবে, তিনি তোমাকে কত ভালবাসবেন—আদর করবেন—কত খেল্‌না-পুতুল দেবেন—"বলিতে বলিতে অপূর্ব্ব স্নেহপরায়ণা বাসন্তী চুম্বনের উপর চুম্বনে বালিকার মুখ ভরাইয়া দিল। নরেন্দ্রের চোখে তখন জল আসিতেছিল, কষ্টে সামলাইয়া কহিল—"কিন্তু—"

বাসন্তী চমকাইয়া উঠিল ! জিজ্ঞাসা করিল—"কিন্তু—কি ?"

—"ভাবছি,...কিন্তু—মিছিমিছি আর আমাকে ছোটাবে কেন ? তাকে নলিনের সঙ্গেই বরং ;—"

বাসন্তী অস্থির হইয়া উঠিল ! সভয় চঞ্চল কণ্ঠে কহিল—"রক্ষে করুন—সর্ব্বনাশী সব পারে, আপনার দুটি পায়ে পড়ছি তা করবেন না। আগে তাকে এখানে রেখে গিয়ে, পরে আপনার বন্ধুর কাছে যাবেন। অনেক কষ্ট এ হতভাগিনীর জন্য স্বীকার করেছেন, আরো কষ্ট পেতে বল্‌তে পারি না,...কিন্তু—আমার বর্ত্তমান—"

নরেন্দ্র ভাবিয়া বলিল—"বুঝেছি, না কাজ নেই থাক্‌, তাকেই আগে পৌঁছে দিয়ে যাব।...এখন তোমার অমলদিদি কোথায় ? তার সঙ্গে আগে আমার বোঝাপড়া আছে, সে বড় নাক সিট্‌কে বলেছিল যে—নার্সে কি মা বাপের মত সন্তানের সেবা-যত্ন করতে পারে !" বলিয়া নরেন্দ্র তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল।...

...জ্যোৎস্নাকে অনেক কষ্টে ভুলাইয়া, চোখে আবার একটা পাতলা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়া বাসন্তী যখন বাহিরে আসিল, তখন

চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া নরেন্দ্র তাহারই প্রতীক্ষায় ছটফট্ করিতেছিল। বাসন্তী কহিল—"অবস্থা সব স্বচক্ষে দেখ্‌লেন তো? এখন বলুন আমার কর্ত্তব্য কি?"

নরেন্দ্র গম্ভীর চিন্তিত স্বরে জবাব করিল—"তোমার [illegible] নির্দ্দেশ করে দেওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। যে ভুলের ভুলেতে ভুলে, প্রবল ইচ্ছা-শক্তির ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে বালিকা এত সত্বর এমন কঠিন পীড়াকে জয় করে উঠেছে, সে ভুল ভাঙ্গ্‌তে দিলে এখন আর শুধু সে ব্যামো নয়, তার জীবন-সঙ্কট উপস্থিত হতে পারে।...এদিকে আগাগোড়া সকল ব্যাপারের আলোচনা করে, সহসা তোমার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করাও আমার সাধ্য, কেন না—তোমার বিদায় হবার সঙ্গে বালিকার জীবন-মরণের সম্বন্ধ জড়িত রয়েছে। আমি শুধু এইটুকু বল্‌তে পারি বোন্ যে,—আত্মবিসর্জ্জন করে, নিষ্কাম পর-সেবার বাড়া ধর্ম্ম জগতে আর নেই, বিশেষ করে যেখানে জ্ঞানহীন পবিত্র শিশুর জীবন-মরণ সমস্যা।"

বাসন্তী, ক্ষণকাল গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতে করিতে সহসা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে কহিল—"তবে আমার সেই সেবাব্রতই পূর্ণ করবার সহায়তা করুন,...দিন-কতকের জন্যও অত [illegible] উমাকে এনে আমার কছে রেখে দিয়ে যান!"

—"আমিও ঠিক তাই ভাবছিলাম বোন, দেখি ঘটনাস্রোত কোন্ দিকে যায়!...আমরা সকলেই দৈবের অধীন, ঘটনাস্রোত রোধ করবার শক্তি আমাদের কারও নেই। সেই স্রোতের তৃণ হয়ে গা ভাসিয়ে দাও—ভগবান নিশ্চয় কূল দেবেন,—এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।...যেখানে মান-অভিমান—অহঙ্কার—আত্মম্ভরিতা,—যত গোলমাল বাধে কেবল সেই খানেই। সেবাব্রতধারিণী তুমি,—ভগবানের উপর অটল বিশ্বাস আর নির্ভরতা রেখে, স্রোতে গা ভাসিয়ে দাও।...আমার যা কিছু ভয়—

কেবলমাত্র ওই অমলদিদিটিকে, কিন্তু তার সঙ্গে একটু রহস্যের অভিনয়ের আবশ্যক হয়েছে—তার সূচনাও আজ করে গেলুম।”

* * অতঃপর নরেন্দ্র তখনকার মত বিদায় হইয়া, তিন দিন পরে আবার যখন উমাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া অমলদিদির কাছে—‘সহকারী হিন্দুনার্স’ বলিয়া পরিচিত করিয়া দিল, তখন অমলা একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। সে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না যে, যখন প্রকৃতই দুইজন নার্স নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হইতে পারিত, তখন না আনিয়া, যখন পূর্ব্বনিযুক্ত নার্সের আবশ্যকতাও ফুরাইয়া আসিয়াছে, তখন ডাক্তারবাবু কেন আর একটি নূতন মানুষকে আনিয়া জোর করিয়া গছাইয়া দিয়া গেলেন! ..সে মৃতা বিজলীলতাকে স্মরণ করিয়া, তাহার পরিত্যক্ত, সঞ্চিত অর্থের অপব্যয়ের পরিমাণ হিসাব করিয়া মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু সহসা বাসন্তী আসিয়া—পরম উল্লাসে—এই নূতন মানুষটির হাত ধরিয়া—একেবারে হিড় হিড় করিয়া টানিতে টানিতে মুহূর্ত্তের ভিতরেই জ্যোৎস্নার কক্ষের ভিতরে অদৃশ্য হইয়া গেল।...

* * সপ্তাহ পরে তনয়ার আরোগ্য সংবাদ পাইয়া, নলিন যত না আনন্দে অধীর হইয়া গৃহে ছুটিয়া আসিল, তার চেয়ে শতগুণে অধিক বিস্ময়ে চঞ্চল হইয়া উঠিল—যখন বাড়ীতে পা দিবামাত্রই জ্যোৎস্নাকুমারী ছুটিয়া গিয়া তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া উঠিয়া আহ্লাদভরে একশোবার কেবলই বলিতে লাগিল—“মা এসেছে—আমার মা ফিরে এসেছে, দেখবে এসনা বাবা!”

বালিকার কথা শুনিয়া, নলিন একেবারে স্বপ্ন-বিহ্বলের মত অবাক হইয়া, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিল। কিন্তু অমলা একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া, একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে আপনা-আপনি বলিয়া উঠিল—“হা রে অভাগি! ঈশ্বর করুন তোর এ বিশ্বাসের মূল যেন সহসা না শিথিল হয়ে পড়ে!”

২।১।১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

অধিকতর বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া নলিন উৎকণ্ঠাপূর্ণ দৃষ্টি তুলিয়া অমলার মুখের উপরে নিবদ্ধ করিল। অমলা ইঙ্গিতে মনোভাব ব্যক্ত করিয়া কহিল —"আশ্চর্য্য বটে, উভয়ের ভিতরে বিশেষ কোন প্রকার পার্থক্যের ব্যবধান আমরা কেউ বার করে উঠতে পারিনি।...এ রকম আশ্চর্য্য অদল-বদল—ও শিশু—"বলিতে বলিতে সহসা থামিয়া—অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া, চিন্তিত ভাবে উপসংহার করিল—

"আরো আশ্চর্য্য যে—খোদ মায়ের কাছ থেকেও এমন নারসিং আশা [illegible]ত পারা যেতো না।...শুধু তারই আদর, যত্ন চেষ্টা আর শুশ্রূষার গুণে [illegible]ছা আমার হারানো নয়নের মণি দুটি ফিরে পেয়েছে।"

নলিনের হৃদয়ে, বিস্ময়-সাগর মথিত করিয়া, একটা দলিত স্মৃতি—মেঘের কোলে বিদ্যুৎস্ফূরণের মত—থাকিয়া থাকিয়া কেবলই মাথা ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল! উত্তেজনায়—আশঙ্কায়—আহ্লাদে—নিরাশায় তোলপাড় করিতে করিতে কে যেন তাহার বাক্‌শক্তি একেবারে হরণ করিয়া লইল। কেবলই একটা অধীর ঔৎসুক্য নব-বলে জাগিয়া উঠিয়া, তাহাকে পুনঃপুনঃ ভিতর বাড়ীর দিকে টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, অথচ কেমন একটা আশঙ্কা এবং নৈরাশ্য একত্র মিলিয়া তাহার পা দুটোকে যেন শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিল!

সহসা—নিখিল বিশ্বের সমস্ত শক্তিকে বলীয়ান করিয়া জ্যোৎস্নাকুমারী কহিল—"চলনা বাবা—মাকে দেখবে না বুঝি?"

বলিয়াই হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বাড়ীর ভিতরে লইয়া চলিল। মেয়ের ইচ্ছাশক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া নলিন, চুম্বকে আকৃষ্ট লোহার মত, তাহার পিছনে-পিছনে চলিল। সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া, একটা ঘরের ভিতর দিয়া দ্বিতীয় কক্ষের অভিমুখে দুই চারি পা আগাইয়াই, জ্যোৎস্না বলিয়া উঠিল—"ওই দেখ বাবা—মিছে?...মা—মা—"

বাসন্তী সেই ঘরের দোরগোড়াতেই আসিয়া পড়িয়াছিল! ক্ষিপ্র হরিণ-শাবকের মত ছুটিয়া গিয়াই, জ্যোৎস্না তাহার গায়ের উপরে প্রবল-ভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

ঘরে-বাহিরে দাঁড়াইয়া, সহসা উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিয়াই—একবার থর-থর করিয়া কাঁপিয়া কাঠ হইয়া গেল!

জ্যোৎস্না মাঝে না থাকিলে কি হইত বলা যায় না। কিন্তু সেই একটুখানি মেয়ে যে সহসা কি যাদুমন্ত্রে নিমিষের ভিতরেই উভয়ের চট্‌কা ভাঙ্গিয়া—দৌর্ব্বল্য দূর করিয়া কথার অবসর যোগাইয়া দিল, তা' বোধ করি খোদ বিধাতা-পুরুষেরও কল্পনার অতীত!

পরমুহূর্ত্তেই জ্যোৎস্না আবার বাপের কাছে ছুটিয়া গিয়া, হাত ধরিয়া জোরে একটা টান দিয়াই বলিল—"এস না বাবা, অমন করে দাঁড়িয়ে ভূত দেখ্‌ছো না কি?" বলিতে বলিতে হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিতে টানিতে বাসন্তীর সম্মুখে আনিয়া কহিল—"সত্যি ভূত বুঝি?...মা যে,...না মা? এই দেখ।"

বলিয়াই আবার ঝাঁপাইয়া গিয়া তাহার কোলে উঠিয়া—দুই হাতে গলা জড়াইয়া ধরিল। তারপরে তাহার মুখে চুমো খাইতে খাইতে পুলকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে চাহিল। বাসন্তী আর নীরব থাকিতে পারিল না, কচি মুখখানিতে বারম্বার চুম্বন করিতে করিতে গভীর স্নেহের আবেগে বলিল—"আমার জীবনের গর্ব্ব ভেঙে দিলিরে দস্যি!"

২১।১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

বিংশ পরিচ্ছেদ

আরও একটা দিন পরের কথা।—

কলিকাতা হইতে নরেন্দ্র এই মাত্র উমাকে তড়িতার জিম্মায় রাখিয়া দিয়া আপন বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে!

তড়িতা উমাকে নাওয়া-খাওয়ার জন্য জেদ্ করিতেছিল—"বেলা ১২টা বেজে গেছে উমি!—এখানে রোগের সেবা করতে এসে তোর সেবা যেন না করতে হয়।...শীগ্‌গীর নেয়ে আয়!—না খেয়ে পিত্তি পড়লে অসুখ যে হবেই—এটা ডাক্তারের গিন্নী হ'য়েও তুই যে কেন বুঝ্‌তে পারিস্‌না—এইটুকুই আমার সবচেয়ে আশ্চর্য্য ঠেকে!...যা—যা—আর দেরী করিসনি!"

উমা আসিয়াই, ঘরের মেজেয় পা ছড়াইয়া বসিয়া ছিল!—ইচ্ছা—আগে নলিনদার সঙ্গে খুব খানিক ঝগড়া করিবে!—কিন্তু নলিন তড়িতাকে [illegible] প্রতিষ্ঠিত বুঝিয়া, সেই যে খুব ভোরের বেলায় একটা নূতন কণ্ট্রাক্টারী কাজের জন্য গ্রামান্তরে গিয়াছিল, এখনও ফিরিয়া আসে নাই।

উমা কহিল—"কোথায় গেলেন?—"

তড়িতা বুঝিয়াও, বুঝিতে পারে নাই যেন!—কহিল—"কে?"

উমা অতিরিক্ত বিদ্রূপের ভঙ্গিমায় কহিল—"তোমার মনিব গো! তোমার শ্রীশ্রীমনিবঠাকুর!...যাঁর বাড়ীতে চাকরি নিয়ে র'য়েছ—তিনি!"...তারপর ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"আচ্ছা দিদি!—একটা কথা ব'লবো?"

তড়িতা উমার দুখানি হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে কহিল—"না বলতে হবে না। বখামি করে করে তোর ভয়ানক বদ্‌স্বভাব হ'য়ে গেছে উমি! শীগ্‌গীর ওঠ্ বল্‌ছি!"

উমা তড়িতার হাত চাপিয়া কহিল—"দেখ দিদি!—আমার যখন বদ্‌স্বভাব হ'য়েই গেছে, তখন তো আর উপায় নেই!—কিন্তু কথাটা আমার শুনতেই হবে!—ব'লবো?"

তড়িতা কপট ক্রোধে মুখখানা বেজায় ভারী করিয়া কহিল—"আচ্ছা বল্!...গেরো!..."

—"কিন্তু সাদা মনে জবাব দিতে হবে ভাই!...আচ্ছা এখানে রোগের সেবা করতে এসে, তুমি খুবই হয়রান্ হয়ে প'ড়েছ—না?...আচ্ছা টাকাকড়ি কি কত পেলে না পেলে তাওতো কিচ্ছু জানালে না? অথচ ক'লকাতায় থাক্‌তে যতবার যতটাকা পেয়েছ, সব আমার হাতেই—"

—"থাম্ উমি!—মুখে লাগাম্ দিয়ে কথা বল্!"

উমা হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে লাগিল। কহিল—"লাগাম্ তার মুখেই ভাল সাজ্‌বে দিদি!—যাকে মনিব সাজিয়ে গোলাম করে রেখেছ! ...কিন্তু মিছিমিছি এত রেগে যাচ্ছো কেন বল তো?"

তড়িতা হাসিয়া ফেলিল। পুনরায় উমাকে হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে কহিল—"লক্ষ্মী ভাই আমার! আগে খাওয়া-দাওয়া করে, তারপর যা ইচ্ছে হয় তর্জ্জমা করিস্!...ওঠ্!"

উমা আর কিছু না বলিয়া স্নানের ঘরে চলিয়া গেল। এবং যাইতে যাইতেই তড়িতাকে শোনাইতে ভুলিল না—"যার বাড়ী তার সঙ্গে দেখা হ'ল না!—অতিথিসৎকার করবেন—উনি!...যত সব অনধিকার চর্চ্চা!... তুমি বাবু কে এখানকার?—আজ যদি বলে—'কাজ ফুরিয়ে গেছে!—' তা হ'লেই তো বস্—"

তড়িতা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল—"দেখ্ উমি!—ক'দিন কাছে ছিলুম না—বড্ড বেড়ে উঠেছিস, না?—"

উমা কথা কহিল না। আপনার হৃদয়ের অতিরিক্ত হর্ষোচ্ছ্বাস হৃদয়ের মধ্যেই উপভোগ করিতে করিতে স্নান শেষ করিয়া কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত দ্বিতলের বড় হলঘরটায় আসিয়া ডাকিল—"অমলদিদি!—ও অমলদি!—" …যেন কত কালের চেনা!

অমলা থতমত খাইয়া নিকটে আসিতেই, উমা কহিল—"গায়ে পড়া হ'য়ে না হয় এসেই হাজির হ'য়েছি, কিন্তু এমনি ক'রে মুখ ফিরিয়ে থাকাই কি ভদ্রলোকের কাজ দিদি…" বলিয়া অমলার মুখের পানে এমন স্নিগ্ধ চাহনি দিয়া তাহাকে অভিসিক্ত করিয়া দিল যে, অমলা শশব্যস্তে তাহার দুখানি হাত ধরিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আমার সব ত্রুটী মার্জ্জনা কর বোন্!—তোমাকে চিন্‌তে পারিনি!"

উমা যেন কতই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে—এমনি ভাব আনিয়া কহিল—"চিন্‌তে এখনি কি পেরেছ?—এই যে এতগুনো কথা বল্লুম, এর পরেও কি তুমি আমাকে চিন্‌লে?…উঃ—কি কুটুম্বিতে বাবা তোমাদের……এতক্ষণ ভিজে কাপড়খানা প'রে দাঁড়িয়ে রয়েছি, একটিবার ভুলেও যদি ব'লে—ওরে পোড়ারমুখী—কাপড় ছাড়!"

অমলা অপ্রতিভের একশেষ হইয়া গৃহান্তরে কাপড় আনিতে ছুটিয়া গেল!

ইতিমধ্যে তড়িতা আসিয়া দাঁড়াইতেই—উমা তাহার আঁচলের চাবির রিংটা তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল—"একখানা কাপড় আর স্যামিজ জ্যাকেট যা হয় কিছু বের করে দাও দিদি!…ভিজে কাপড়ে ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে রয়েছি, শেষটায় নিউমোনিয়া না হয়!"—

তড়িতা চাবি লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়া গেল—"ওঃ—ডাক্তারের বিদ্যেটা তোর একচেটে হ'য়ে গেছে দেখছি।"...ইহারই মধ্যে অমলা, বিজলীর বাক্স খুলিয়া খুব দামী একখানা শাড়ী আনিয়া দিতেই বালিকা জ্যোৎস্না ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"পিসীমা! কাপড়খানা মাকে না জিজ্ঞেস্ করে পরোনা কিন্তু!...ওখানা মা খালি খালি দেখে আর তুলে রাখে!—"

বিস্মিত হইয়া, মুগ্ধনেত্রে উমা জ্যোৎস্নার পানে চাহিয়া রহিল!...অমলা কহিল—"তা হোক্‌গে—তুমি পরো উমা!...আমি ব'ল্‌ছি!"—বলিয়া অলক্ষ্যে সজল চোখ দুটি পরিষ্কার করিয়া লইল!...

সত্য সত্যই উমার সেই দামী কাপড়খানা পরিতে সাহস অথবা ইচ্ছা হইতেছিল না। যে কাপড় বিজলী তার জীবিতকালে ব্যবহার না করিয়া কেবল দেখিয়া নয়ন সার্থক করিত, না জানি তাহার ইতিহাসের পাতায় কি লিপিবদ্ধ আছে!

তড়িতা জামা কাপড় আনিয়া দিতেই, উমা অমলার পানে স্নেহ-দৃষ্টি মেলিয়া বলিল—"বউদি যা মায়া করে একটা দিনও ব্যবহার করতে পারেনি,—আমি এমন হৃদয়হীন হ'তে পারিনি দিদি!—যে—তাই নিষ্ঠুরের মত প'রে নষ্ট করবো!...ওখানা আসল জায়গায় রেখে দাওগে!"

অমলা স্বর্গগতা ভগিনীর স্মৃতি ভাবিয়া দুঃখিতও যতখানি হইল, উমার অন্তর্নিহিত অলৌকিক সারল্য এবং সামঞ্জস্য ভাবিয়া সুখীও তত খানিই হইল! তড়িতার হাতে কাপড়খানি দিয়া কহিল—"রান্নাঘরটা একবার ঘুরে আসি, তুমি কাপড়খানা বিজুর বাক্সে রেখে দিয়ো!"—বলিয়া চাবির ছড়াও তড়িতার হাতে দিল।

তড়িতা, উমা ও জ্যোৎস্না তিন জনেই বাটীর সর্ব্বাপেক্ষা সজ্জিত

প্রকোষ্ঠে আসিয়া বসিলে, জ্যোৎস্না কহিল—"হ্যাঁ মা!—বাবা আর কতক্ষণ দেরী করবে?..."

তড়িতা উমার সম্মুখে লজ্জা গোপন করিতে না পারিয়া, নীরবে রহিল।

উমা কহিল—"মেয়েকে তার বাপের খবর দিতেও কি মানা নাকি বউদি?...আচ্ছা পাষাণী মা তো?"

তড়িতা একটা কিছু বলিবার জন্য হাঁফাইয়া উঠিতেছিল, ঠিক এমনি সময়ে নলিন ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে ডাকিল—"তড়ি!—"

উমা হাসির বেগটা দমন করিবার জন্য যথাসম্ভব জোরে মুখে কাপড় গুঁজিতে লাগিল।

উমাকে দেখিয়াই, নলিন বিস্মিতের চরম হইয়া কহিল—"এ কেরে!—তুই কখন এলি?...নরু এসেছে?"

তড়িতাই জবাব দিল—"তিনি ও বাড়ী গেছেন।...উঁনিকে আমি এখানেই রেখে দিলুম!"

উমা নলিনের পায়ে মাথাটা ঠেকাইয়াই জ্যোৎস্নাকে কোলে করিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেল।

নলিন ডাকিয়া বলিল—"ওরে—ও পাগ্‌লী! কথা না ক... চলে যাচ্ছিস কেন?"

উমা যাইতে যাইতে জ্যোৎস্নাকে যে কথা কানে কানে শিখাইয়া দিল, তাহার ফলে—জ্যোৎস্নাই জবাব দিল—"পিসীমার ভয়ানক অভিমান হ'য়েছে বাবা!"—

নলিন হাসিয়া কহিল—"সে কিরে!—কার ওপর তোর পিসীমা অভিমান করলে?"

তোতা পাখীর মত বালিকা জবাব দিল—"পিসীমার বউদির ওপর!"

তড়িতা মাথা নত করিল, নলিনও বিপুল পুলকোচ্ছ্বাসে অভিভূত হইয়া পড়িল।

মিনিট দু'তিন পরে, নলিন ডাকিল—"উমা!...জ্যোৎস্না!" কিন্তু উমা তখন রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া জ্যোৎস্নাকে আহার করাইতেছিল। ডাক শুনিতে পাইল না।

* * * *

নলিন আর তড়িতা—ঘরের মধ্যে মাত্র দুইজন উপস্থিত!...

নলিন কহিল—"আচ্ছা তড়ি!—জ্যোৎস্নার তুমি সত্যি সত্যিই 'মা' হ'য়ে গেছ, না?"

তড়িতা লজ্জিত হইয়া ঈষৎ হাসিল, এবং বিজলীর বাক্সটা খুলিয়া সেই কাপড়খানি রাখিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

নলিন কহিল—"দেখি—দেখি!—এ কাপড়টা তো বিজলী একদিনও পরে নি!...ও-হ্যাঁ-মনে পড়েছে, এটা না কি তার কোন এক বন্ধু বিয়ের সময় উপহার পাঠিয়েছিল," বলিতেই হঠাৎ মৃতা পত্নীর অতীত কথাবার্ত্তা সবই তাহার স্মৃতি পথে আসিয়া দেখা দিল!

তড়িতা তখন কাপড়ের পাড়ের একটি জায়গায় লিখিত অংশটুকু পাঠ করিতেছিল।—নলিন হাত বাড়াইয়া বলিল "দেখি—কি—লেখা র'য়েছে?"

তড়িতা লিখিত অংশ অনায়াসেই বুঝিতে পারিয়াছিল, নলিনের হাতে দিতেই সে পাঠ করিল—

"আমার মনের বনের সোণার হরিণ—
বন ছেড়ে হায় চ'ল্‌লো রে!"

—ইতি অভাগা—"মনো—"

পড়া শেষ হইতেই—নলিন অসাধারণ গম্ভীর হইয়া প্রায় পাঁচ মিনিট কাল নীরবে বসিয়া রহিল।

২১।১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

তড়িতা বলিল—"ঘড়িটায় যে একে একে সবগুলো বেজে গেল ?...নাওয়া খাওয়া হবেনা বুঝি ?"

আন্‌মনার মত নলিন জবাব দিল—"হ্যাঁ—নাওয়া-খাওয়া ?......এই যে !"—তারপর হঠাৎ তড়িতাকে আপনার বেদনাবিক্ষুব্ধ বুক খানায় জোরে চাপিয়া ধরিয়া, তাহার মুখে চোখে অজস্র চুম্বন করিতে করিতে প্রেমস্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল—"বুকখানায় দাবানলের ব্যথা পোরা র'য়েছে—তড়ি !...একটা যুগ চলে গেছে—এই মহাজ্বালার সঙ্গে যুদ্ধ করে করে !...তড়িতা —তড়ি !"

তড়িতার কথা বলিবার অবসর ছিল না। আনন্দের প্লাবনে তাহার বলা-কওয়ার সকল শক্তি সর্ব্বস্বত্ব হারাইয়া, বাঞ্ছিত দেবতার চরণমূলে আত্মহারার মতই মাথা লুটাইতেছিল !···কিশোর-জীবনের কানায় কানায় যখন যৌবনের জোয়ার আসিয়াছিল, তখন সে তুফানক্ষণের অনাবিল মুহূর্ত্তকে ধন্য করিয়া দিয়াছিল যে, সে আজ কত দীর্ঘ বিরহের অবসানে আজ তাহারই অন্তরের দুয়ারে অতিথি !...সুন্দর বাঞ্ছা করা—পবিত্র লগনের ক্ষণে, সর্ব্ব বিশ্ব—অলসমদিরায় যখন ঢলিয়া পড়িয়াছিল—তখন এমনি আদরে, এমনি প্রণয়ের পবিত্র মধুরিমায় সে তাহার চিরবাঞ্ছিতের কণ্ঠে এমনি ডাক শুনিয়াছিল—"তড়ি !—তড়িতা !"

...আর আজ !—আজ কত দিনের পর !—কত কষ্টের কত দুঃখের কত বেদনার মহানিশা অবসানের শুভক্ষণে—আবার সেই সকল অন্তর আনন্দের হাওয়ায় তোলপাড় করিয়া দিয়া, তৃষিত শ্রবণের দুয়ারে ডাক আসিল—প্রিয়া—প্রিয়া !—

আর কি থাকা যায় !—মন-যমুনার কূলে কূলে, সকল বনানী মুখরিত করিয়া, বাঁশীর ধ্বনি মলয় হাওয়ার কাঁপনে কম্পিত হইয়া ডাকিতেছে—প্রিয়া—প্রিয়া—প্রিয়া !—

প্রিয়তমের আলিঙ্গনবদ্ধা তড়িতা আবেশে আঁখি মুদিয়া ভাবিতেছিল—সংসারের আগুন বাতাসে যখন দেহমন ঝালাপালা হইয়া গিয়াছিল, তখন তো জানি নাই—দগ্ধ অদৃষ্টকে শান্তি-শীতলতায় ভরিয়া দিয়া, তাহাকে একদিনে এমনি করিয়াই সৌভাগ্য রাজ্যের রাজ-রাজেশ্বরী করিয়া তুলিবে তাহার মনোমন্দিরের একচ্ছত্র সম্রাট !...কিন্তু কোথায় আজ তার জন্ম-দুঃখিনী জননী !—যিনি জীবনে শুধু দুঃখই লইয়া গিয়াছেন !

...নলিন তড়িতাকে পাশে বসাইয়া তাহার চূর্ণ কুন্তল সরাইয়া দিতে দিতে কহিল—"অভিমান করোনা তড়িতা !—নিয়তি তার খেলার সাধ-আহ্লাদ তোমার আমার জীবনের মাঝখান দিয়েই মিটিয়ে দিয়েছিল !···কিন্তু আর তো ভয় নেই তড়ি ! তুফান কেটে গেছে !—আলোয় আলোয় ভুবন ছেয়ে উঠেছে !···আর কেন অভিমান তড়ি ?"

তড়িতা চোখ মুছিয়া লাজনম্রা বধূটির মতই ভাল হইয়া বসিল। তারপর খেদের সুরে কহিল—"আজ কেবলই মনে পড়ছে আমার দুঃখিনী মায়ের কথা !"

নলিনও নয়নাশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। কহিল—"মমতার বস্তুকে ইহলোকে ছেড়ে গিয়ে, পরলোকের অধিবাসী শান্তি পায় না তড়িতা !......মাসীমা—স্বর্গ থেকে আজ সে শান্তি ভোগ করবেন !"

সহসা তড়িতা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিল—"কিন্তু সব কথা পরে বলো !—আগে দেহটাকে ঠাণ্ডা করে নাও !—স্নানের ঘরে জল-টল সব ঠিক আছে,...দেরী ক'রোনা !"

নলিন উঠিয়া স্মিতমুখে কহিল—"আজ আর বাড়ীতে নাইবোনা তড়ি !—আজ মনের আগুন নিভে গেছে ! বাইরের ময়লামাটীগুনোও ধুয়ে আসি !···আমি নদীর ঘাটে চল্লুম !—"

২১।১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

তড়িতা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"সে কি!—এই দুপুরে! না না, তোমার জন্তে বাড়ীশুদ্ধ লোক কি উপোষ করে থাক্‌বে নাকি?...আমার খিদে পেয়েছে কিন্তু!"

নলিন বাহিরে যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—"যার দরদ বেশী সে নিশ্চয়ই উপোষ করবে—নইলে আনন্দটা জমাটি হবে কেন?"...

———

একবিংশ পরিচ্ছেদ

কথা বলিতেছিল—নরেন্দ্র ও তড়িতা।

—"তা হ'লে আমরা কলকাতায় ফিরে যাই ?"

—"আমরা মানে ?"

—"মানে—উমা আর আমি—"

—"ও সব চালাকী চ'লবেনা কিন্তু, উমাকে অন্ততঃ মাস খানেক আমি পাঠাচ্ছি না।"

হঠাৎ উমা আসিয়া বলিল—"উমাকে তো পাঠাবেনা ব'লে ধনুক ভাঙ্গা পণ করে রয়েছ !—কিন্তু উমাকে রাখবে কোন্খানে শুনি ?"

তড়িতা হঠাৎ অপ্রতিভ হইয়া গেল। কহিল—"কেন যেখানে আমি নিজে র'য়েছি, সেই খানেই।"

উমা স্বামীর উপস্থিতি স্বত্ত্বেও, নির্লজ্জার ন্যায় কহিল—"নিজে তো চাকরী করতে এসে, যেচে বাড়ীর গিন্নীপনা ঘাড়ে নিয়েছ, কিন্তু আমাকেও কি তাই করতে বল নাকি ?...দাদার বাড়ী হলেও, আমি এখানে থাক্‌বো না।"...তারপর স্বামীর দিকে ফিরিয়া কহিল—"সব জায়গায় শুনেছি, লোকে বলে—তুমি বুদ্ধিমানের সেরা !—কিন্তু তোমার মত বোকা মানুষ দুনিয়ায় আর একটা থাক্‌লেই বুদ্ধিমান যারা, তাদের মাথায় সব গোলমাল হ'য়ে যেত !...ওকে রেখে যাচ্ছো কোথায় ?...বাইরের একটা লোক যদি দাদার কাছে ওর পরিচয় চায়, তাহ'লে দাদাই বা কি জবাব দেবে ?—আর ও নিজেই বা কি বলবে ?"

নরেন্দ্র নীরবে মাথা হেঁট করিয়া রহিল। তড়িতাও আর উঁচু মাথায় কথা কহিতে পারিল না। সে ভাবিল—"তাইতো! আনন্দের ক্রম-প্রসারিত উচ্ছ্বাসের জালে সে এমন করিয়া আবদ্ধ হইয়া গেছে যে,—ভবিষ্যতের কথা কি একদম বিস্মৃতির পর পারেই ঠেলিয়া দিয়াছে!"

উমা কহিল—"কি?...কথার যে ফুটকড়াই ফোটে! এখন [illegible] দাও দিদি?"

তড়িতা চুপ করিয়া রহিল।

উমা নরেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"আর তুমি?—বুদ্ধিমানের শিরোমণি!—তোমার কি জবাব?"

নরেন্দ্র, পত্নীর বুদ্ধিমত্তায় মনে মনে খুশী হইয়া কহিল—"আ[illegible] [illegible]ন্ধ্যায় নলিনকে সব বলে ক'য়ে রাখছি।"

উমা তড়িতার গা টিপিয়া দিয়া খুব নীচু গলায় কহিল—"কি দি[illegible] একদিন যে পাগল বলে ঠাট্টা করেছিলে, আজ পাগলের বুদ্ধিটা পরখ ক[illegible] তো?...বাবা! চাঁদপানা মুখখানা দেখে ভূত-ভবিষ্যতের মাথাটি [illegible] মড়িয়ে চিবিয়ে ফেলেছিলে—"

নরেন্দ্র দুজনের কথা বলার ভঙ্গী দেখিয়া ধীরে ধীরে অন্তত্র [illegible] গেল।......

তড়িতা জিজ্ঞাসা করিল—"জ্যোতি কোথা?—জ্যোছনা?"

উমা হাসিয়া কহিল—"দুপুর বেলায় যা বায়না ধরেছিল—বাপ্!—সামলাতে গিয়ে আমার কম নাকালটা হ'ল!"...

তড়িতা জিজ্ঞাসা করিল—"কিসের বায়না?"

—"যাও যাও আর মা-গিরি ফলাতে হবে না!...মাতৃস্নেহ যা, তা আজ দুপুরেই টের পাওয়া গেছে!"

—"ব্যাপার কি বল্ না?" বলিয়াই তড়িতা ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া গেল।

উমা নানারকম রঙ ফলাইয়া কথাটাকে এমনি সুন্দরভাবে সাজাইয়া বলিল যে, তড়িতা না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

উমা বলিল—"মেয়েটা বায়না ধরলে—মার সঙ্গে না হ'লে আমি কিছুতেই খাবো না!—"

তড়িতা বলিল—"তা আমায় ডাকিসনি কেন?"

—"কেমন করে ডাকি বল? শেষটায় অভিশাপ কুড়িয়ে মরবো? তখন যে অলস দুপুরে...বদ্ধ গৃহ-কোণে,...বাঞ্ছিত সহবাসে..."

সহসা তড়িতা উমার চুলের মুঠি ধরিয়া গুম্ গুম্ করিয়া তাহার পিঠে কীল মারিতে মারিতে বলিল—"দাঁড়া তোর আস্পদ্ধা ভাঙ্‌ছি!—"

উমাও কীল খাইয়া পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে হাসিয়া কহিল—"আস্পদ্ধা আগেই ভেঙে দিয়েছ ঠাক্‌রুণ! নইলে মেয়েটার জেদ বজায় রাখ্‌তে আমি সেই বাসর-মন্দিরেই হাজির হ'য়ে যেতুম!...নিজের স্পর্দ্ধাটাকে নিজেই দেবে রেখেছিলুম সে শুধু খাতির করে!"

উমা কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকিয়া, ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা দিদি?—"

—"কেন?"

—"আচ্ছা...নিরিবিলি পেয়ে, দাদা তোমায় কি ব'ললে?...সে বুঝি অনেক কথা—না?"

—"যা যা বিরক্ত করিসনি—"

—"তবু বলই না ছাই...কি ব'ললে?—অয়ি শরদিন্দুনিভাননি! যুগান্ত অদর্শনের পর—"

—"তুই মর!...পোড়ার মুখীর এতটুকু যদি সমীহ থাক্‌বে!... ঐ দেখ্ কে আসছে—"

...নলিন আসিয়া কহিল—"জ্যোৎস্না অমলদিদিকে মেরে খুন করে দিলে যে!"

তড়িতা মুখ তুলিয়া চাহিল, উমা কহিল—"কেন?" নলিন তড়িতার পানে একটা চোরা চাহনি চাহিয়া বলিল—"বলে—মা কোথা গেল—"

এবার কিন্তু উমা পরিহাস করিয়া কথা বলিল না। বেশ ধীর সংযত ভাবে কহিল—"দেখ দাদা! মিছিমিছি বায়না করে—শুধু ছেলে পিলেরাই! জ্যোতির বায়নার দাম আছে হয়তো,—কিন্তু তার হেতু নেই।...কিন্তু বা তোমার এই বিদ্‌ঘুটে ছেলেমানুষি সহের বাইরে চ'লে গেছে!...মাথাটা মধ্যে মধ্যে খেলিয়ে নিয়ো।"

নলিন বিস্মিত হইয়া বলিল—"কি ব্যাপার তা খুলে বল্?"

—"ঐ তো তোমার ন্যাকামি! ব্যাপারটা কি তুমিই জাননা? জ্যোৎস্না যাকে মা ব'লতে অজ্ঞান হয়, তার সঙ্গে তোমার যা সম্বন্ধ, তা কজনকে ব'লে বেড়াবার মতন সাহস আছে তোমার?—সমাজের কথাটাই বলছিলুম আমি!...ঘরে-বাইরে বাঁধাবাঁধি সম্বন্ধ আর পরিচয়, এ দুটোরই দরকার নয় কি?"

নলিন আনন্দের বেগ বাহিরে প্রকাশ না করিয়া সহজ ভাবেই বলিল—"সে কথা আমি কি মিনিটে মিনিটে ভেবে আসছি উমা! এইমাত্র নরেনও সে কথা আমায় ব'লেছে!...তা,—বেশ তো কাল পরশুর মধ্যেই—"

উমা কহিল—"পরশু আবার কেন? কালকের দিনটাই খারাপ নাকি?"

নলিন আনন্দের সহিত উমার মাথায় হাত দিয়া নীরবে আশীর্ব্বাদ করিল—"স্বামী-সৌভাগ্যবতী হও, সু'পুত্রের জননী হও!"

* * * * *

শুভবিবাহ হইয়া গেল।

দুইটি দুরতিক্রম্য বাধা প্রাপ্ত নদ-নদী, সকল বাধা এড়াইয়া, কলগান-

মুখরিত এক আলোময় কুঞ্জবীথিতলে, আপন আপন মানসাকাঙ্ক্ষিতকে হিয়ায় রাখিয়া ধন্য হইল! সুখ-দুঃখের আবর্ত্তসঙ্কুল সংসার-সমুদ্রের চঞ্চল বুকে—আবার এক নূতন তরঙ্গের আবির্ভাব হইল!—তড়িতা ধন্য হইল, নলিন নিজকে ধন্য মানিল!

* * * বিবাহের পর আরও মাসখানেক থাকিয়া, উমা কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। জ্যোৎস্না কলিকাতা দেখিবার প্রবল ইচ্ছা জানাইয়া উমার সঙ্গে গিয়াছে।...বাড়ীতে অমলা আর তড়িতা, এবং দাস-দাসী পাচক ইত্যাদি। নলিনকে তাহার কণ্ট্রাক্টারী কাজের জন্য মাসের মধ্যে কুড়ি বাইশ দিন বিদেশে থাকিতে হয়।...আজ প্রায় উনিশদিন পর, দীর্ঘ বিরহান্তে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হইয়াছে!

...সেদিন ছিল—কৃষ্ণ পক্ষের তৃতীয়া!...নলিন তার তেতলার ছাদে, উঁচু আলিসায় হেলান দিয়া বিজলীর কথা ভাবিতেছিল!—তড়িতার স্নেহ-পরশ মাখিয়া আজ কাল কেবলই তার মনে হয়, মা-বাপের জেদের বশেই তারা দুজনে প্রথম জীবনে সুখী হইতে পারে নাই। বিজলী তো মরিয়া সকল জ্বালার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে!...কিন্তু সেই অন্যাসক্তা যুবতীর বিবাহিত জীবনের দুঃখময় স্মৃতি কল্পনায় আসিয়া, নলিনকে যখন তখনই ভয়ানক যাতনা দিত!

...মধুপুরে—মনোরঞ্জনঘটিত সকল কথা নলিন নিজে হইতে জানিতে চেষ্টা না করিলেও, বিজলীর রোগের সময় তার অসংলগ্ন প্রলাপের মধ্য দিয়া কতক টের পাইয়াছিল। তারপর সেদিন মনোরঞ্জনের দেওয়া বিজলীর বিবাহের উপহার, এবং সেই উপহারের গায়ে লিখিত—মনোরঞ্জনের খেদোক্তিটুকু পাঠ করিয়া, নলিন মাঝে মাঝে ভাবিত—সংসারের সেরা বুদ্ধি-মান এই মানুষজাতিটা সময় সময় এমনতর নির্ব্বোধের কাজ কেন করে? ...অবিমৃষ্যকারিতার জন্যই আজ বিজলীর অকালমৃত্যু! আর সেই বেচারী

মনোরঞ্জন—কে জানে কে সে, কেমন ভাবে কোথায় আছে!—যদি ভাল-বাসার মহামন্ত্রে তাহার দীক্ষা হইয়া থাকে, তাহা হইলে হয় সে অকালে কালের কোলে ভাসিয়া গিয়াছে, নয় তো তিল তিল করিয়া যক্ষ্মারোগীর মতই মৃত্যুর তিক্ত রসধারা পান করিয়া পরপারের জন্য প্রস্তুত হইতেছে!

...তড়িতা আসিয়া কাছে বসিল।

নলিন কহিল—"আচ্ছা চাঁদেও কলঙ্ক আছে না তড়ি?...অত যে সুন্দর, তবু ওর ভিতরে কলঙ্কমাখা!...জগতের এইটাই রীতি!"

তড়িতা কহিল—"আমি কিন্তু হেঁয়ালির জবাব দিতে এখনও ভাল ক'রে শিখিনি!...আসবার সময় ক'লকাতা হ'য়ে এসেছ?"

—"হ্যাঁ"—

—"জ্যোতিকে আন্‌লে না কেন?"

—"উমা বল্‌লে—আর কিছুদিন থেকে যাবে।...আর সেও আসতে চাইলে না।...হপ্তায় তিন দিন করে বায়স্কোপ দেখা...মেয়েটার কচি মাথা ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে গেছে!...তা আছে বেশ!"

তড়িতা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া ধীরে ধীরে বলিল—"সে তো বেশ আছে, কিন্তু বন্ধ্যা হ'য়ে প্রসব বেদনার জ্বালায় আমি যে জ্বলে মরি!...হ্যাঁ কি ব'লছিলে—চাঁদে কলঙ্ক না কি?"

নলিন গলা ঝাড়িয়া বলিল—"হ্যাঁ; বল্‌ছিলুম—মানুষের একটানা সুখ কপালে সহ্য হয় না!...চিরসুন্দর বলে কোন জিনিসই জগতে নেই!"

তড়িতা ভীত এবং চিন্তিত হইয়া কহিল—"কিন্তু সত্যি বল্‌তে হবে!—তোমার দুটি পায়ে পড়ি;...আমি কি তোমায় সুখী করতে পারিনি?...নির্গুণ অযোগ্যাকে—"

তড়িতার কথা শেষ না হইতেই, নলিন তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া

আনিয়া কহিল—"আগে তো ভয়ানক বুদ্ধি ছিল তোমার, আজকাল এত বড় সংসারের গিন্নী হয়ে বুঝি মাথার গোলমাল হ'য়ে গেছে?···তুমি যে আমার চারিধারে, আমার অন্তরে বাহিরে সুখের অনাবিল উৎস ছড়িয়ে দিয়েছ তড়িতা!...তোমার প্রেমের ঝরনায় নেয়ে উঠে আমি যে নূতন জীবন পেয়েছি তড়ি!...ছিঃ ওকথা মনে এনো না!—আমি কি ব'লছিলুম জানো?"

উন্মুখ প্রতীক্ষায় তড়িতা স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

নলিন বলিতে লাগিল—"হতভাগী বিজলীর কথা...তার কথা ভেবে ভেবেই তো আমার একচেটে সুখে দুঃখের ছায়া এসে পড়ে!..."

তড়িতা গোপনে অশ্রু মুছিয়া পূর্ব্বের মতই চাহিয়া রহিল।

নলিন কহিল—"আমার সুখ দেখে ভাবি—হতভাগী সংসারের কাছে কত বড় জঘন্য প্রবঞ্চনা পেয়েছিল!—যাকে ভাল বাসতো না, নির্ব্বিবাদে বিনা তর্কে, তাকেই স্বামী ব'লে ভেবে, দিনরাত্রি আপন মনের সঙ্গে ছলনার যুদ্ধ ক'রে, তার আশা-বাসনার অস্ফুট জীবন শেষ হ'য়ে গেছে!... যাকে চেয়েছিল, তাকেই যদি সে পেত তড়িতা!—তা হ'লে আজ এক সঙ্গে তিন তিনটে মানুষ—"

তড়িতা স্বামীর ডান হাতখানি আপন মুঠার মধ্যে চাপিয়া বলিল— "আমার একটা কথা রাখ্‌বে?"

নলিন বিস্মিত হইয়া বলিল—"তোমার কথা!—কেন রাখবোনা ব'লে কি সন্দেহ হয় তড়ি?...এতকাল এমন করে বুঝে এসেছ, তবু আমায় সন্দেহ হয়?"

তড়িতা ব্যাকুল হইয়া বলিল—"ওগো!—থামো থামো! আমি কি তাই বলছি?...তোমাকে কি জানিনে আমি?...আমি বলছিলুম—আমাদের এই চাতরার মধ্যে দিদির নামে কিছু একটা প্রতিষ্ঠা করি···স্মৃতি—"

উচ্ছ্বসিত হইয়া নলিন তড়িতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিল—"এ তোমারই উপযুক্ত কথা তড়ি !—এ শুধু তুমিই বলতে পারো !...কিন্তু এর জন্যে আমাকে অনুরোধ করবার প্রয়োজন নেই তো !...তোমার যা অভিরুচি—"

তড়িতা কৌতুক করিয়া বলিল—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ !—আমার অভিরুচি মতই হবে !...কিন্তু একটা মস্ত বড় বিল্ডিং করতে হবে তো ?...তুমি হচ্ছো পাকা কণ্ট্রাক্টার,—সেই জন্যেই তোমাকে অর্ডার দিচ্ছি—"

—"আমি তোমার এ আদেশ মাথায় করে নিলুম তড়িতা !...তুমি যা বলবে, অক্ষরে অক্ষরে আমি ঠিক তা-ই করে যাবো !"

তড়িতা কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর বলিল—"মাসীমার প্রতিষ্ঠিত মেয়ে-ইস্কুলের কাছাকাছি যে প্রকাণ্ড মাঠটা পড়ে আছে, ওইটাতে কাল থেকেই একটা বিল্ডিং সুরু করে দাও !...আমি ভাবছি, ওটাতে 'বিজলী নারী-শিল্পাশ্রম' নাম দিয়ে একটা আশ্রম খুলবো !...আর—"

—"কি আর ?"

—"আর তারই পাশে থাক্‌বে—'বিজলী দাতব্য-ঔষধালয় !' ঐ সঙ্গে ১০।১২টা ঘর থাক্‌বে,—কেবল মাত্র মেয়ে রোগীদের জন্যে !...তিনজন ডাক্তার (তার মধ্যে একজন মেয়ে ডাক্তার) ঐ হাঁসপাতালের ভার নেবেন !"...

নলিন অবাক-বিস্ময়ে তড়িতার উজ্জ্বল মুখের পানে চাহিয়া রহিল !... তখন মধ্য আকাশ হইতে চাঁদের আলো আসিয়া তড়িতার মুখের উপর মাখামাখি হইয়া গিয়াছে !

সমাপ্ত

দেব-সাহিত্য-কুটীর, ২২।১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা